কার্ল মার্কস
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ
১৮৫৭-১৮৫৯

সূচি*

ভূমিকা
ভারতে বৃটিশ শাসন। মার্কস
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি — তার ইতিহাস ও ফলাফল। মার্কস
ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল। মার্কস
ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ। মার্কস
ভারতে অভ্যুত্থান। মার্কস
ভারত প্রশ্ন। মার্কস
ভারত থেকে ডিসপ্যাচ। মার্কস
ভারতীয় অভ্যুত্থানের অবস্থা। মার্কস
ভারতে অভ্যুত্থান। মার্কস
ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মার্কস
*ভারতে জুলুমের তদন্ত। মার্কস
*ভারতে অভ্যুত্থান। মার্কস
*ভারতে বৃটিশ আয়। মার্কস
ভারতে অভ্যুত্থান। মার্কস
*ভারতে অভ্যুত্থান। মার্কস
*ভারতে অভ্যুত্থান। মার্কস
*ভারতে অভ্যুত্থান। মার্কস
*ভারতে অভ্যুত্থান। মার্কস
*দিল্লি দখল। এঙ্গেলস
আসন্ন ভারতীয় ঋণ। মার্কস
উইন্ডহ্যামের পরাজয়। এঙ্গেলস
লক্ষ্ণৌ দখল। এঙ্গেলস
*লক্ষ্ণৌ আক্রমণের বিশদ বিবরণ। এঙ্গেলস
অযোধ্যা গ্রাস। মার্কস
*লর্ড ক্যানিঙের ঘোষণা ও ভারতে ভূমি বন্দোবস্ত। মার্কস
*ভারতে অভ্যুত্থান। এঙ্গেলস
*ভারতে বৃটিশ আর্মি। এঙ্গেলস
ভারতে ট্যাক্স। মার্কস
ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। এঙ্গেলস
ভারত বিল। মার্কস

*ভারতে অভ্যুত্থান। এঙ্গেলস
'ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জি' থেকে উদ্ধৃতি। মার্কস
পত্রাবলী
এঙ্গেলস সমীপে মার্কস। ১৫ আগস্ট, ১৮৫৭
মার্কস সমীপে এঙ্গেলস। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭
মার্কস সমীপে এঙ্গেলস। ২৯ অক্টোবর, ১৮৫৭
মার্কস সমীপে এঙ্গেলস। ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৫৭
এঙ্গেলস সমীপে মার্কস। ১৪ জানুয়ারি, ১৮৫৮
এঙ্গেলস সমীপে মার্কস। ৯ এপ্রিল, ১৮৫৯
টীকা
নামের সূচি
স্থানসূচি

* তারকা চিহ্নিত প্রবন্ধগুলির শিরোনামা দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট থেকে — সম্পাঃ।

ভূমিকা

ভারতে ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় মুক্তি বিদ্রোহের ওপর কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (New-York Daily Tribune) পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, প্রধানত তাই এ সংকলনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে বিপ্লবের প্রাক্কালে ১৮৫৩ সালে ভারত পরিস্থিতির ওপর মার্কসের লেখা কিছু প্রবন্ধ, তাঁর 'ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী' থেকে কিছু উদ্ধৃতি এবং অভ্যুত্থান বিষয়ে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পত্রাংশ।

১৮৫০-এর দশকের শুরু থেকেই মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদী দেশগুলির উপনিবেশিক কর্মনীতি ও নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সর্বদাই খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রাচ্য দেশগুলির, বিশেষ করে এশিয়ার উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির, প্রধানত ভারত ও চীনের ইতিহাস অনুধবান করেন তাঁরা।

লুঠেরা পুঁজিবাদী উপনিবেশিক কর্মনীতির লক্ষ্যস্থল এই দুটি বৃহৎ দেশের ঐতিহাসিক ভবিতব্য নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস যা ভেবেছেন সেটা সর্বোপরি প্রলেতারীয় মুক্তি সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ভারত ও চিনে পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ত সম্পর্কের ভাঙন এবং পুঁজিবাদী বিকাশের পথে তাদের ক্রমিক উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের আয়োজন গড়ে উঠছিল তার বিপ্লবী প্রতিক্রিয়াকে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখেছিলেন একটা নতুন গুরুত্বপূর্ণ করণিকা হিসাবে, যা অনিবার্যই আসন্ন ইউরোপিয় বিপ্লবকে প্রভাবিত করবে। এই জন্যই মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৫৭ সালের বসন্তে যে ভারত অভ্যুত্থান দেখা দেয় তা অত মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করেছিলেন। অভ্যুত্থানের প্রতিটি প্রধান প্রধান ঘটনায় সাড়া দিয়েছেন তাঁরা, প্রবন্ধাদিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তার কারণ, পরাজয়ের হেতু, লড়াই ও তার ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে। তাঁদের মতে ১৮৫০-এর দশকে প্রায় সারা এশিয়ায় নিপীড়িত জাতিগুলির যে সাধারণ উপনিবেশ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করছিল, তারই একটা অংশ হল এ অভ্যুত্থান। তাঁরা এটা দেখেছিলেন যে এ অভ্যুত্থান ইউরোপিয় বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত এবং তাঁদের মত ছিল, সে ইউরোপিয় বিপ্লব ঘটবে সে সময় ইউরোপের দেশগুলিতে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রথম বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ভেঙে পড়েছিল তারই পরিণতি হিসেবে।

সংকলন শুরু হয়েছে মার্কসের 'ভারতে বৃটিশ শাসন', 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি — তার ইতিহাস ও ফলাফল' এবং 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল, এই তিনটি প্রবন্ধ দিয়ে। এগুলি তিনি লিখেছিলেন ১৮৫৩ সালে, যখন পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্বিবেচিত হয় সেই প্রসঙ্গে। ভারত ইতিহাসের ওপর বহু প্রামাণ্য লেখকের রচনা খুঁটিয়ে পর্যালোচনার ভিত্তিতে এ প্রবন্ধগুলি লেখা, উপনিবেশিকতার প্রসঙ্গে মার্কসের আপোসহীন বিরোধিতা তাতে জাজ্বল্যমান, জাতীয় উপনিবেশিক সমস্যা প্রসঙ্গে তাঁর সেরা রচনাগুলির মধ্যে এগুলির নিঃসন্দেহ স্থান আছে। বস্তুতপক্ষে, ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান যে কারণে অনিবার্য হয়ে ওঠে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পূর্বপ্রতিজ্ঞা এতে পাওয়া যাবে।

এই সব প্রবন্ধে ভারত বিজয় ও তার দাসত্ববন্ধনের একটা গভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন মার্কস এবং বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন তথা শোষণের রূপ ও পদ্ধতির বৈচিত্র দেখিয়েছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তিনি বর্ণনা করেছেন ভারত বিজয়ের হাতিয়ার রূপে এবং এইটে জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ভারত ভূখণ্ড তারা দখল করে লুঠেরা যুদ্ধ মারফত, স্থানীয় রাজন্যদের সামন্ত কলহের সুযোগ নিয়ে এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে বর্ণ, ধর্ম, কুলগোষ্ঠী ও জাতিভেদপ্রথার উসকানি দিয়ে।

মার্কস দেখিয়েছেন, বৃটেনের শাসক চক্রতন্ত্রের সমৃদ্ধির একটা প্রধান সূত্র হল ভারতের উপনিবেশিক লুণ্ঠন এবং তাতে করে ভারতীয় অর্থনীতির এক একটা সমগ্র শাখা ভেঙে পড়ে, চূড়ান্ত রকমের দরিদ্র হয়ে পড়ে এই সুবিশাল, সমৃদ্ধ ও প্রাচীন দেশটির জনগণ। তিনি বলেন, বৃটিশ হামলাদাররা পূর্ত কর্মে অবহেলা করে ভারতের সেচ-কৃষির ধ্বংস সাধন করে। স্থানীয় শিল্প, বিশেষ করে তাঁত ও চরকাকে ধ্বংস করে তারা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে অনশনে নিক্ষেপ করে — ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেলা বৃটিশ সূতীমালের সঙ্গে এঁটে উঠা ছিল এদের পক্ষে অসম্ভব। উপনিবেশিকরা গোষ্ঠীগত ভূমি-মালিকানার পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে ফেলে। সেই সঙ্গে কিন্তু জমিদারি ও রায়তোয়ারি এই দুই ধরনের ভূমি খাজনা ও ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে তারা

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বহু সামন্ত অবশেষ জীইয়ে রাখে, তাতে এ দেশটার অগ্রবিকাশ মন্দীভূত হয়, ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভারতীয় কৃষক।

ভারতের বৃটিশ কর্তারা রায়ত চাষির ওপর চাপায় অসহ্য করভার, স্থানীয় সামন্ত অভিজাত ও উপনিবেশিক রাষ্ট্র এই দুনো জোয়ালের তলে রাখে তাকে। ১৮৫৩ সালের লেখায় এবং ভারতীয় বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখা তাঁর ক্রমান্বয় প্রবন্ধগুলিতে মার্কস দেখান যে, অতি গুরুভার ট্যাক্স, আদায়, জবরদস্তি ও নিষ্ঠুর নির্যাতন সইতে হয় ভারতীয় চাষিকে, ট্যাক্স কলেক্টর সর্বত্রই তা চালায়। ভারতে বৃটেনের আর্থিক কর্মনীতির একটা সরকারিভাবে স্বীকৃত অঙ্গাঙ্গি প্রথা হয়ে দাঁড়ায় নির্যাতন (‘ভারতে জুলুমের তদন্ত’, ‘ভারতে অভ্যুত্থান’, ‘ভারতে ট্যাক্স’ ইত্যাদি)। অথচ, সংগৃহীত ট্যাক্সের কোনো অংশই পূর্ত কার্যরূপে লোকের কাছে ফেরত আসত না, যদিও এই পূর্তকার্য অন্য যে কোনো দেশের চাইতে এশীয় দেশগুলিতেই বেশি অপরিহার্য — এইটে মার্কস বিশেষ জোর দিয়ে দেখান।

মার্কস সিদ্ধান্ত টানেন যে, ভারতে বৃটিশ হামলাদারদের লুঠেরা কর্মনীতি ও উপনিবেশিক শোষণের বর্বর পদ্ধতিই ভারতীয় বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে।

অভ্যুত্থান শুরু হয় যেসব প্রত্যক্ষ কারণে তাকে মার্কস ও এঙ্গেলস ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন ১৯ শতকের মাঝামাঝি বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতে যেসব অদলবদল হয়, বিশেষ করে দেশীয় সৈন্যবাহিনীর কাজের ক্ষেত্রে, তাদের সঙ্গে। ‘বিভক্ত করে শাসন করা’ এই নীতিতে বৃটেন ভারত জয় ও কার্যত কোনো বিরাট দুর্যোগ বিনাই দেড় শতক ধরে তা শাসন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু, মার্কস লেখেন, ১৯ শতকের মাঝামাঝি থেকে তাদের প্রভুত্বের পরিস্থিতিতে বেশ বদল হয়। ততদিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভূখণ্ড জয় শেষ করে একমাত্র বিজয়ীরূপে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় জনগণকে অধীনস্থ রাখার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সহায়তা খুঁজত তার সৃষ্ট দেশীয় সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে, এ বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য তখন সামরিক কাজ থেকে বদলে দাঁড়িয়েছে পুলিসী কাজ, বিজিত জনগণকে দমন। মার্কস বলেন, ২০ কোটির এক জনসংখ্যাকে এইভাবে অধীনে রাখা হচ্ছে ২ লক্ষের এক দেশীয় সৈন্যবাহিনী দিয়ে, যার অফিসাররা হল ইংরেজ এবং যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় ৪০ হাজারের এক ইংরেজ ফৌজ দিয়ে। কিন্তু দেশীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে বৃটিশরা ভারতে ‘সেই সঙ্গেই ভারতীয় জনগণের জন্য এই সর্বপ্রথম একটা সাধারণ প্রতিরোধ-কেন্দ্র সংগঠিত করে বসে’ (বর্তমান সংকলনের ৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। মার্কস সিদ্ধান্ত টানেন, ঠিক এই কারণেই বুভুক্ষাপীড়িত লুণ্ঠিত রায়তদের থেকে নয়, সাধারণ অভ্যুত্থান শুরু করে সুবিধাভোগী মোটা মাইনের সিপাহিরা — ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সৈনিক ও অফিসাররা, যারা প্রধানত এসেছে উঁচু জাত থেকে। ইংরেজদের একটা একান্ত বিশ্বাস ছিল যে ভারতে তাদের সমস্ত শক্তিই হল সিপাহি সৈন্য, আর সেই সৈন্যদলই যে তাদের পক্ষে প্রধান বিপদসূত্র — এ সত্যে অকস্মাৎ তাদের চোখ খোলে (‘ভারত থেকে ডিসপ্যাচ’)।

মার্কস কিন্তু দেখান যে, সিপাহীরা হাতিয়ারের বেশি কিছু নয় (‘ভারত প্রশ্ন’)। অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি ছিল ভারতীয় জনগণ, অসহনীয় উপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে নামে। বৃটিশ শাসক শ্রেণিরা অভ্যুত্থানকে কেবল সশস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহ রূপে দেখাতে চায়, তার সঙ্গে যে ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ জড়িত তা লুকাতে চায় তারা — এদের এই মিথ্যা দাবির খণ্ডন করেন মার্কস ও এঙ্গেলস। তাঁরা প্রথম থেকেই আন্দোলনটিকে দেখান একটা জাতীয় বিদ্রোহ হিসাবে, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের বিপ্লব রূপে (‘ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ’, ‘ভারতে অভ্যুত্থান’ প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং ‘ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী’)। মার্কস ও এঙ্গেলস বিশেষ জোর দেন এই ঘটনায় যে, বিদ্রোহ শুধু বিভিন্ন ধর্মের (হিন্দু-মুসলিম) এবং বিভিন্ন জাতের (ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিখ) লোককে নয়, বিভিন্ন সামাজিক পঙক্তির লোককেও একত্র করেছিল। মার্কস লেখেন, ‘এই প্রথম সিপাহী বাহিনী হত্যা করল তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের, মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে, ‘হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে

এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে', বিদ্রোহ শুধু কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি ...' (বর্তমান সংকলনের ৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিদ্রোহে জনগণের অংশগ্রহণের কথা চেপে যাবার জন্য বৃটিশ প্রেস যথাসাধ্য করলেও মার্কস তাঁর প্রথম দিককার প্রবন্ধগুলিতেই জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতীয় জনগণ শুধু বিদ্রোহে সাগ্রহ সহানুভূতি দেখাচ্ছে না, সর্ববিধ উপায়ে তার সহায়তাও করছে। 'ভারতে অভ্যুত্থান' প্রবন্ধে মার্কস নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, জনগণের ব্যাপক অংশ, সবচেয়ে বেশি চাষিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভ্যুত্থানে অংশ নেয়। মার্কস লেখেন, বিদ্রোহের অসীম ব্যাপকতা এবং স্বীয় সৈন্যদের জন্য সরবরাহ ও পরিবহন সংগ্রহে ইংরেজদের যে প্রতি পদে মুশকিলে পড়তে হচ্ছে এগুলি ইংরেজ হামলাদারদের প্রতি ভারতীয় কৃষকদের শত্রুভাবের সাক্ষ্য।

'অযোধ্যা গ্রাস', 'লর্ড ক্যানিঙের ঘোষণা ও ভারতে ভূমি বন্দোবস্ত' এবং অন্যান্য প্রবন্ধে মার্কস দেখান যে, তখনো স্বাধীন ভারতীয় অঞ্চলগুলিকে গ্রাস ও দেশীয় রাজন্যদের ভূমি বাজেয়াপ্তি মারফত বৃটিশ সম্পত্তি সবলে সম্প্রসারণের নীতিও বিদ্রোহের একটি অন্যতম আশু কারণ। গ্রাস করা অঞ্চলগুলির জনসাধারণ বহু কষ্ট ভোগ করে। ভারতীয় সম্পত্তিবান শ্রেণিগুলির একটা বড়ো অংশের মধ্যে বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জেগে উঠে। দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে বহু দশক ধরে যেসব চুক্তি চলে আসছিল তা মানে না ইংরেজরা। সরকারিভাবে স্বীকৃত চুক্তি ভঙ্গ করে তারা স্বাধীন ভারতীয় অঞ্চল গ্রাস করে নেয়। এই জন্যে এবং স্বাভাবিক উত্তরাধিকার না রেখে কোনো দেশীয় রাজা মারা গেলে তার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করার ফলে ভারতীয় সামন্ত ভূস্বামীদেরও বিরাগ জাগে।

বিদ্রোহের সময় ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যেও বৃটিশ বিরোধী মনোভাব যথেষ্ট ছিল — কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক চালু ভারতীয় যুদ্ধ ঋণের ব্যর্থতায় এ ঘটনা সমর্থিত হয়।

ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিপূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তাঁদের আশা ছিল বিপ্লব বিজয়ী হবে।

এই সাফল্যের শর্ত তাঁরা দেখেছিলেন উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সমস্ত সংগ্রামযোগ্য অংশের অভ্যুত্থানে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে। যাই হোক, এ রকম সাধারণ সংগ্রাম সম্ভব হয়নি এবং তার কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণ ছিল : ভারতের সামন্ত বিভাগ, ভারতীয়গণের নরকৌলিক বৈচিত্র্য, জনগণের মধ্যে ধর্ম ও জাতের বিচ্ছিন্নতা, এবং যারা বিদ্রোহে নেতলতব করেছিল সেই সব সামন্ত অভিজাতদের অধিকাংশের বিশ্বাসঘাতকতা।

মার্কস ও এঙ্গেলসের বিবেচনায় অভ্যুত্থানের পরাজয়ের একটা অন্যতম প্রধান কারণ হল একটি একক কেন্দ্রীভূত অভ্যুত্থানী নেতৃত্ব ও একটি একক সামরিক সেনাপত্যের অভাব। বিদ্রোহী শিবিরের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও বিভেদও তার একটি কারণ। বিদ্রোহীদের নিকৃষ্ট সামরিক বল ও সুসজ্জিত ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর অভিজ্ঞতার অভাবও বিদ্রোহের পরিণামের ওপর মারাত্মক হয়। বিদ্রোহের মূল ছকটা তাতে হয়ে পড়ে অস্থির, সামরিক মহড়ায় সাফল্যের সম্ভাবনা কমে এবং বিদ্রোহীদের মনোবল শোচনীয় রকমে নষ্ট হয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙখলা এবং শেষ পর্যন্ত পরাজয় হয় তাদের ('দিল্লী দখল', 'লক্ষ্ণৌ দখল', লক্ষ্ণৌ আক্রমণের বিশদ বিবরণ')। কিন্তু, মার্কস ও এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন, সমস্ত রকম কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও অভ্যুত্থানীরা সাহসী লড়াই চালায়, বিশেষ করে বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে — দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে। দিল্লী রক্ষায় পরাজিত হলেও জাতীয় বিদ্রোহের পূর্ণ শক্তি তারা দেখিয়ে দেয়, সেটা, এঙ্গেলস বলেন, আসলে আসে নিয়মিত যুদ্ধে ততটা নয়, যতটা গেরিলা লড়াইয়ে।

একাধিক প্রবন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস 'সুসভ্য' বৃটিশ উপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীর, পরাজিত অভ্যুত্থানীদের ওপর তাদের বর্বরতার এবং অধিকৃত বিদ্রোহী শহর ও গ্রাম লুণ্ঠনের সর্বনাশা বিবরণ দিয়েছেন।

ভারতীয় বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচারে মার্কস দেখান যে, তাতে ভারতে উপনিবেশিক আমল বিশেষ কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত না হলেও উপনিবেশিক দাসত্বের প্রতি ভারতীয় জনগণের সাধারণ ঘৃণা এবং মুক্তি সংগ্রামের দৃঢ় সামর্থ্য প্রকাশ পায়। বিদ্রোহের ফলে উপনিবেশিক শাসনের রূপ ও পদ্ধতি কিছুটা

পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় বৃটিশ উপনিবেশিকরা। তার নানা ফলাফলের একটি এই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তুলে দেয় তারা, এ কোম্পানির কর্মনীতি সমগ্র ভারতীয় জনগণের সাধারণ বিরাগ জাগিয়ে তুলছিল।

মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে অবিচল যোদ্ধা, উপনিবেশিক দাসত্ব থেকে ভারতীয় জনগণের মুক্তিতে তাঁদের দৃঢ় আস্থা ছিল। মার্কস দেখান যে, বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতে উৎপাদন-শক্তির যে উন্নতি হচ্ছে তাতে ভারতীয় জনগণের ভাগ্য উন্নত হবে না যতদিন না ভারতীয় জনগণ বৈদেশিক উপনিবেশিক নিপীড়নের অবসান করে নিজেরাই স্বদেশের প্রভু হতে পারছে। এ লক্ষ্যসিদ্ধির দুটি পথ দেখেছিলেন মার্কস — হয় বৃটেনে প্রলেতারীয় বিপ্লব, নয় বিদেশী উপনিবেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে খোদ ভারতীয় জনগণেরই একটা মুক্তি সংগ্রাম। মার্কস লেখেন, ‘খাস গ্রেট বৃটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসক শ্রেণি স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না।’ (বর্তমান সংকলনের ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহের শতবার্ষিকী ভারতীয় জনগণ উদ্‌যাপন করেন যে পরিস্থিতিতে তখন উপনিবেশিকতা থেকে ভারত মুক্তি বিষয়ে মহান প্রলেতারীয় নেতার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে গেছে। উপনিবেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও দীর্ঘায়ত সংগ্রামে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে ভারত, অটল হয়ে পা দিয়েছে স্বাধীন জাতীয় বিকাশের রাস্তায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট

কার্ল মার্কস

ভারতে বৃটিশ শাসন (১)

লন্ডন, শুক্রবার, ১০ জুন, ১৮৫৩

ভিয়েনার তার-বার্তায় বলা হয়েছে যে তুর্কী সার্ডিনীয় ও সুইস প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সেখানে নিশ্চিত বলে ধরা হচ্ছে (২)।

গতরাত্রে কমন্স সভায় ভারত বিতর্ক (৩) চলতে থাকে স্বাভাবিক একঘেয়ে ধরনে। স্যার চার্লস উড ও 'স্যার জে. হগের বিবৃতিতে আশাবাদী মিথ্যার ছাপ আছে বলে মিঃ ব্ল্যাকেট অভিযোগ করেন। মন্ত্রিসভা ও ডিরেক্টরদের (৪) একগাদা উকিল যথাসাধ্য সে অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করে এবং অপরিহার্য মিঃ হিউম এই বলে উপসংহার টানেন যে মন্ত্রীরা বিল প্রত্যাহার করুন। বিতর্ক মুলতুবী রাখা হয়।

হিন্দুস্তান যেন এশীয় আয়তনের এক ইতালি, হিমালয় তার আল্পস্, বাংলার সমভূমি যেন তার লম্বার্দি সমভূমি, দাক্ষিণাত্য তার অ্যাপিনাইঞ্জ এবং সিংহল তার সিসিলি দ্বীপ। জমির উৎপন্নের সেই একই সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং রাজনৈতিক চেহারায় সেই একই খণ্ড খণ্ড ভাব। বিজয়ীর তরবারির চাপে ইতালি যেমন মাঝে মাঝে বিভিন্ন জাতির সমষ্টিকে এক করেছে, তেমনি দেখা যায় হিন্দুস্তানেও মুসলমান বা মোগল বা বৃটনদের চাপ যখন থাকেনি, তখন হিন্দুস্তানও যতগুলি বিবদমান স্বাধীন রাষ্ট্রে ভেঙে গেছে তার সংখ্যা হিন্দুস্তানের নগর এমন কি গ্রামগুলির সংখ্যার মতো। তবু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, ইতালি নয়, হিন্দুস্তান হল প্রাচ্যের আয়র্ল্যান্ড। এবং ইতালি ও আয়র্ল্যান্ড — কামনার এক জগতের সঙ্গে দুর্দশার এক জগতের এই বিচিত্র মিলন — তা হিন্দুস্তানের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সূচিত। এ ধর্ম যুগপৎ কামনাতিশয্য ও আত্মনিগ্রহী ব্রহ্মচর্যের ধর্ম, লিঙ্গাম্ আর জগন্নাথদেবের ধর্ম, সন্ন্যাসী ও বায়াদেরের (দেবদাসীর) ধর্ম।

নজির দেবার জন্যে স্যার চার্লস উডের মতো কুলি খাঁর উল্লেখ না করেও আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই যাঁরা হিন্দুস্তানের স্বর্ণযুগে বিশ্বাস করেন (৫)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আওরঙ্গজেবের সময়টা ধরা যাক, অথবা উত্তরে যখন মোগল এবং দক্ষিণে পোর্তুগিজদের উদয় হল সেই যুগটা, অথবা মুসলিম অভিযান ও দাক্ষিণাত্যের হেপ্তার্কি (৬)। কিংবা চাই কি, আরো অতীতে গিয়ে স্বয়ং ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ইতিবৃত্তটাকেই নেওয়া যাক — তাতে ভারতীয় দুর্দশার প্রারম্ভ বলে যে কাল-নির্দেশ হয়েছে, সেটা বিশ্বসৃষ্টির খৃস্টিয় ধারণারও আগে।

অবশ্য এতে কোনো সন্দেহই নেই যে বৃটিশেরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এশীয় স্বৈরাচারের ওপর যে ইউরোপিয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে এমন এক দানবীয় জরাসন্ধ সৃষ্টি করেছে যা সালসেট মন্দিরের রোমহর্ষক স্বর্গীয় দানবদের চাইতেও বেশি দানবীয়, তার কথা আমি বলছি না। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের কোনো বৈশিষ্ট্যসূচক দিক এটা নয় — এ হল শুধুই ওলন্দাজদের অনুকরণ এবং এতখানি অনুকরণ যে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের সংজ্ঞা দিতে হলে জাভার ইংরেজ কোম্পানি সম্পর্কে যা বলেছিলাম, তার আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করলেই যথেষ্ট :

'ওলন্দাজ কোম্পানি শুধুমাত্র লাভের লালসায় প্ররোচিত হয়েছিল এবং আগে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার বাগান-মালিক বাগানের কুলিবাহিনীকে যে দৃষ্টিতে দেখত তার চেয়েও কম শ্রদ্ধা ও কম বিবেচনার সঙ্গে তারা দেখত তাদের প্রজাদের, কারণ বাগান-মালিককে মনুষ্য-সম্পদ ক্রয় করার জন্যে টাকা দিতে হয়েছিল, এদের দিতে হয়নি। এ কোম্পানি স্বেচ্ছাতন্ত্রের সবখানি প্রচলিত যন্ত্র প্রয়োগ করেছিল লোকগুলোর কাছ থেকে যত বেশি পারা যায় আদায় করার জন্যে, নিংড়ে নেবার জন্যে তাদের মেহনতের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এবং এইভাবে খামখেয়ালী ও অর্ধবর্বর এক সরকারজনিত সর্বনাশ বাড়িয়ে তুলত। রাজনীতিকদের অভ্যস্ত সবখানি ধূর্ততা ও ব্যবসায়ীদের সবখানি একচেটিয়া স্বার্থপরতার সঙ্গে সে যন্ত্রকে পরিচালিত করে।'

হিন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সব কিছু গৃহযুদ্ধ, অভিযান, বিপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নিচে নামেনি। কিন্তু ইংলন্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙ্গে দিয়েছে, পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরনো জগতের অপহৃতি অথচ নতুন কোনো জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার ওপর এক অদ্ভুত রকমের শোকের আবির্ভাব ঘটে। বৃটেন-শাসিত হিন্দুস্তান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

এশিয়ায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল, কোষাগার বা রাজস্ব অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠনের বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ, এবং পরিশেষে পাবলিক ওয়ার্কসের বিভাগ। আবহাওয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে, বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতারিয়ার মধ্যে দিয়ে সমুন্নত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ বৃহৎ মরু-অঞ্চলের অস্তিত্বের ফলে খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি। যেমন মিশর ও ভারতে, তেমনি পারস্য, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশেও বন্যার জল দিয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন করা হয়, জলের উচ্চতার সুবিধা নিয়ে সেচের খালগুলিতে জলের জোগান দেওয়া হয়। মিতব্যয়ী ও সাধারণ জল-ব্যবহারের এই প্রাথমিক যে প্রয়োজন থেকে প্রতীচ্যে যেমন, ফ্ল্যান্ডার্স ও ইতালির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি স্বেচ্ছামূলক সমিতিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়, তার জন্যে প্রাচ্যে দরকার হয়েছিল সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ — কেননা প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল অতি নিচের স্তরে এবং অঞ্চলের ব্যাপ্তি এত বিপুল যে স্বেচ্ছামূলক সমিতি সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্ত এশীয় সরকারগুলির ওপরেই একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব এসে বর্তায় — পাবলিক ওয়ার্কস সংগঠন করা। ভূমির এই কৃত্রিম উর্বরীকরণ যা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল এবং সেচ ও জল-নিঃসরণ ব্যবস্থার অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে যা ক্ষয় পেতে থাকে, তা থেকেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এই বিচিত্র ঘটনাটির — কেন আমরা পালমিরা ও পেত্রায়, ইয়েমেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এবং মিশর, পারস্য ও হিন্দুস্তানের বড়ো বড়ো প্রদেশে দেখি, একদা অতি উত্তমরূপে কর্ষিত জমি সবখানি আজ বন্ধ্যা ও মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে। এ থেকেও ব্যাখ্যা করা যায় কেমন করে একটি মাত্র বিধ্বংসী যুদ্ধেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে, তার সমস্ত সভ্যতা লোপ পায়।

এখন, পূর্ব ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে রাজস্ব ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কসটা একেবারেই অবহেলা করেছে। সেই জন্যেই কৃষির এ অবনতি, অবাধ প্রতিযোগিতার বৃটিশ নীতি — দ্মন্মহ্মপ্রঙ্গু শ্লত্রপ্র৹ দ্মন্মহ্মপ্রঙ্গু ঀদ্দপ্রত্র (৭) এই নীতিতে এ কৃষি পরিচালিত হতে পারে না। কিন্তু সাধারণত এশীয় সাম্রাজ্যগুলিতে কৃষি এক সরকারের আমলে অবনত হচ্ছে আবার অন্য সরকারের আমলে উন্নত হচ্ছে। ইউরোপে যেমন ভালো মন্দ ঋতু অনুসারে ফসলের অবস্থা বদলায়, ওখানে তেমনি বদলায় ভালো মন্দ সরকার অনুসারে। সুতরাং কৃষির পীড়ন ও অবহেলা যত খারাপই হোক, ভারতীয় সমাজের ওপর সেইটাই বৃটিশ অভিযানকারীদের চূড়ান্ত আঘাত বলে গণ্য করা যেত না, যদি এর সঙ্গে একেবারে অন্য রকম গুরুত্বের একটি পরিস্থিতি, সমগ্র এশীয় জগতের ইতিহাসের পক্ষেই যা অভিনব, তার সংযোগ না ঘটত। ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে। সে সমাজ-কাঠামোর খুঁটি হল হস্তচালিত তাঁত আর চরকা, যা থেকে তাঁতি আর সূতাকাটুনির খাঁটি অক্ষৌহিণীর সৃষ্টি। অবিস্মরণীয় কাল থেকে ইউরোপ ভারতীয় শ্রমের অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং তার বদলে পাঠিয়েছে তার বহুমূল্য ধাতু — সে ধাতু পৌঁছিয়েছে ভারতের স্বর্ণকারের কাছে, ভারতীয় সমাজের এক আবশ্যিক সদস্য সে — এ সমাজে অলঙ্কার-প্রিয়তা এত বেশি যে নিম্নতম শ্রেণির লোকেরা পর্যন্ত, যারা প্রায় নগ্নগায়ে ঘোরে তারাও সাধারণত এক জোড়া সোনার মাকড়ি আর গলায় কোনো না কোনো রকমের সোনার গহনা পরে। হাত-পায়ের আঙুলে আংটি পরাও খুব চল। নারী ও ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পরে ভারি ভারি কঙ্কণ আর সোনারূপোর মল, এবং ঘরে থাকে সোনারূপোর তৈরি দেবদেবীর মূর্তি। বৃটিশ হামলাদাররাই এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙে ফেলে, ধ্বংস

করে চরকা। ইংলন্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তুলাবস্ত্রকে বিতাড়ন করতে, অতঃপর সে হিন্দুস্তানে সূতা পাঠাতে থাকে এবং পরিশেষে তূলার মাতৃভূমিকেই কার্পাস বস্ত্র চালান দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন থেকে ভারতে সূতা চালানের অনুপাত বেড়ে ওঠে ১ থেকে ৫,২০০ গুণ। ১৮২৪ সালে ভারতে বৃটিশ মসলিনের চালান ১০,০০,০০০ গজও প্রায় নয়, অথচ ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ গজও ছাড়িয়ে যায়। অথচ একই সময়ে ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০-এ নেমে আসে। বস্ত্রের জন্যে বিখ্যাত এই সব ভারতীয় শহরগুলির অবক্ষয়টুকুই কিন্তু চরম ফলাফল নয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে বন্ধন ছিল বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান তাকে উন্মিলিত করে দিয়েছে।

এই দুটি অবস্থা — একদিকে সকল প্রাচ্যবাসীর মতো হিন্দু কর্তৃক তার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাথমিক শর্তস্বরূপ বড়ো বড়ো পাবলিক ওয়ার্কসের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া, এবং অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধনে ছোটো ছোটো কেন্দ্রে জোট বাঁধা — এই দুইটি অবস্থায় প্রাচীনতম কাল থেকে একটা বিশেষ চরিত্রের সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে — সৃষ্টি করেছে তথাকথিত গ্রাম-ব্যবস্থা, তাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি সম্মিলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবনধারা। এই ব্যবস্থার বিশিষ্ট চরিত্র বোঝা যাবে ভারত বিষয়ে বৃটিশ কমন্স সভার একটি পুরনো সরকারি দলিলের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে :

‘ভৌগোলিকভাবে দেখলে একটি গ্রাম হল কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর আবাদী বা পতিত জমির এক একটি অঞ্চল, রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা কর্পোরেশন বা পৌর গোষ্ঠীর মতো। তার পরিচালক ও সেবকদের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত ধরনের : পটেল খ্খ্=স্নদণ্ড অথবা প্রধান মণ্ডল, তার ওপর সাধারণত গ্রামের অবস্থা-ব্যবস্থার তদারক করার ভার, অধিবাসীদের মধ্যেকার ঝগড়ার সে মীমাংসা করে, পুলিসের কাজ দেখে, এবং স্ব-গ্রামের অভ্যন্তর থেকে কর-সংগ্রহের কাজ চালায় — ব্যক্তিগত প্রভাব এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্বার্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এ দায়িত্বের পক্ষে সে হয় সবচেয়ে উপযোগী। কার্নম ক্কত্রঁফ চাষের হিসাব রাখে এবং চাষ সংক্রান্ত সব কিচু নথিবদ্ধ করে। তৈলার বস্নদঙ্কপ্রত্রফ আর তোত্তী বস্=স্লপ্রফ — প্রথম জনের কাজ অপরাধাদির সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে পৌঁছে দেওয়া ও রক্ষা করা, অপর জনের এখতিয়ার গ্রামেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার কাজ হল শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পরিমাপে সাহায্য করা। সীমানাদার — তার কাজ গ্রামে সীমানারক্ষা এবং কলহ উপস্থিত হলে সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। জলাশয় ও জলপ্রণালীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষির জন্যে জলের বিলি ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণ করে গ্রামের পূজা-অর্চনা। গুরু মশায়কে দেখা যায় গ্রামের ছেলেপিলেদের বালির উপর লিখতে পড়তে শেখাচ্ছেন। পঞ্জিকা-ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষী ইত্যাদি। এই সব পরিচালক ও সেবকদের নিয়েই সাধারণত গ্রামের ব্যবস্থাপনা, কিন্তু দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সে ব্যবস্থাপনা এত প্রসারিত নয়, উপরিকথিত দায়-দায়িত্বের কতকগুলি একই ব্যক্তি পালন করে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে উপরিকথিত লোক ছাড়াও অনেক বেশি লোক দেখা যায়। এই সরল ধরনের পৌর-শাসনের আওতায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে এ দেশবাসী বাস করে আসছে। গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে বচিৎ, এবং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা মারীমড়কে গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এমন কি বিধ্বস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ, এমন কি একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগবিভাগ নিয়ে অধিবাসীরা মাথা ঘামায় না, গ্রামটি অখণ্ড হয়ে থাকলেই হল, কোন শক্তির কাছে তা গেল, কোন সম্রাটের তা করায়ত্ত হল এ নিয়ে তারা ভাবে না। গ্রামের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকে। সেই একই পটেল থাকে প্রধান মণ্ডল তথা ক্ষুদে বিরপতি বা শাসনকর্তা এবং গ্রামের কর আদায়ের কাজ সে তখনো চালিয়ে যায়।’ (৮)

এই সব ছোটো ছোটো বাঁধাগৎ ধরনের সামাজিক সংস্থাগুলি বহুলাংশে ভেঙে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স-সংগ্রাহক ও বৃটিশ সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে তত নয় যতটা ইংরেজের বাষ্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই। ওই সব পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল হাতে কাটা সূতা, হাতে বোনা কাপড় ও হাতে করা চাষের এক বিশিষ্ট সমন্বয়ের কুটির শিল্প, যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর শক্তি। ইংরেজের হস্তক্ষেপ সূতাকাটুনির স্থান করেছে ল্যাঙ্কাশায়ারে এবং তাঁতির স্থান রেখেছে বাংলায়, অথবা হিন্দু সূতাকাটুনি ও তাঁতি উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করেছে এবং এই সব ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়েছে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এই ভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে একমাত্র বিপ্লব।

ওই সব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায় — দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, এ কথা যেন না ভুলি যে এই সব শান্ত-সরল গ্জ্জদদ্রুফ গ্রাম-গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য-মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিচু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা এক একটা হতভাগ্য ভূমিখণ্ডের ওপর পুঞ্জীভূত হয়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়ো শহরের অধিবাসীগণের হত্যাকাণ্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে একতিল বেশি বিবেচনা এদের সম্পর্কে করেনি, এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি। যেন না ভুলি যে এই হীন, অনড় ও উদ্ভিদ্-সুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোটো ছোটো এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এই ভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির পুশবৎ পূজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেব রূপী বানর এবং শবলাদেবী রূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে, ইংলন্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল : এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলন্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।

তাহলে, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে প্রাচীন এক জগতের ভেঙে পড়ার দৃশ্য যত কটু লাগুক, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের অধিকার রইল গ্যেটের সঙ্গে ঘোষণা করা

:

“Sollte diese Qual uns qualen,
Da sie unsre Lust vermehrt,
Hat nicht Myriaden Seelen
*Timurs Herrschaft aufgezehrt?’**

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩ সালের সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
১০ই জুন লিখিত
New-York Daily Tribune পত্রিকার
৩৮০৪ নং সংখ্যায় ১৮৫৩ সালের ২৫শে জুন প্রকাশিত
স্বাক্ষর : কার্ল মার্কস

* ‘এ নির্যাতন থেকে যদি পাই এক বৃহত্তম সুখ, তবে কেন সেজন্যে মনঃপীড়া ? তৈমুরের শাসনের মধ্যেও কি হয়নি আত্মার অশেষ নির্বাণ ?’ গ্যেটের Westostlicher Diwan, An Suleika থেকে — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি — তার ইতিহাস ও ফলাফল

লন্ডন, শুক্রবার ২৪শে জুন, ১৮৫৩

ভারত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন স্থগিত রাখার জন্য লর্ড স্ট্যানলির মোশনের উপর বিতর্ক আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়েছে। ১৭৮৩ সালের পরে ইংলন্ডে এই প্রথম ভারত প্রশ্ন মন্ত্রিসভা-টেকা-না-টেকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন হল ?

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সত্যকার সূত্রপাত হিসাবে ১৭০২ সালের অতি পূর্ববর্তী কোনো যুগকে নির্দিষ্ট করা চলে না, ওই সময়টায় পূর্ব ভারতীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া দাবি করে বিভিন্ন সংঘ একটি একক কোম্পানিতে মিলিত হয়। তার আগে পর্যন্ত আদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্বই বারে বারে বিপন্ন হয়েছে, ক্রমওয়েলের প্রটেক্টরেটের সময় একবার বেশ কয়েক বছর ধরে তা স্থগিত থাকে, একবার তৃতীয় উইলিয়মের আমলে পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপে তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-প্রাপ্তিরই আশঙ্কা দেখা দেয়। ওই ওলন্দাজ রাজকুমারের উত্থান কালেই যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজস্ব-আদায়ী হয় হুইগেরা, যখন জন্ম হয় ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের, যখন ইংলন্ডে রক্ষা-শুল্ক ব্যবস্থা পাকাপাকি কায়েম এবং ইউরোপে শক্তি সাম্যের প্রশ্ন নিশ্চিতরূপেই মীমাংসিত, তখনই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব স্বীকার করে পার্লামেন্ট। বাহ্যিক মুক্তির এ পর্বটা এলিজাবেথ ও প্রথম চার্লস-এর আমলকার মতো রাজকীয় খিলাৎ-সৃষ্ট একচেটিয়ার পর্ব নয়, পার্লামেন্টের অনুমোদনে অধিকারপ্রাপ্ত জাতীয় একচেটিয়ার পর্ব। ইংলন্ডের ইতিহাসের এ পর্বটার সঙ্গে বস্তুত ফ্রান্সের লুই ফিলিপ পর্বের অত্যন্ত সাদৃশ্য বর্তমান — সাবেকি ভূমিজীবী অভিজাতরা পরাজিত কিন্তু টাকা-ওয়ালাদের বা ‘[illegible]’ দের* নিশান ছাড়া তাদের জায়গা নিতে বুর্জোয়ারা তখনো অক্ষম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাধারণ লোককে ভারত বাণিজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে ঠিক সেই সময়টায় যখন কমন্স সভা তাদের বাদ দেয় পার্লামেন্ট প্রতিনিধিত্ব থেকে। এ থেকে তথা অন্যান্য ঘটনা থেকে দেখি, সামন্ত অভিজাততন্ত্রের ওপর বুর্জোয়াদের প্রথম বিজয় মিলে যাচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে অতি প্রগাঢ় এক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে, কবেট-এর মতো একাধিক জনবাদী লেখক যে গণমুক্তির সন্ধান করেছেন ভবিষ্যতে নয় অতীতে, তা এই ব্যাপারেরই তাড়নায়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে একচেটিয়া বিস্তারকারী অর্থস্বার্থের মিলন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ১৬৮৮ সালের ‘গৌরবোজ্জ্বল’ বিপ্লবের (৯) মিলন সাধিত হয় সেই একই শক্তিতে যার সাহায্যে

উদারনৈতিক স্বার্থ ও উদারনৈতিক রাজবংশেরা সর্বদেশে ও সর্বকালে মিলেছে ও জোট বেঁধেছে, — অর্থাৎ দুর্নীতির শক্তিতে, তৃতীয় উইলিয়মের পক্ষে যা আশীর্বাদস্বরূপ এবং লুই ফিলিপের কাছে যা কালান্তক অভিশাপ সেই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ চালক শক্তি। পার্লামেন্টারি অনুসন্ধান থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৬৯৩ সালেই ক্ষমতাধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের 'উপঢৌকন' এই খাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাৎসরিক খরচ দাঁড়ায় ৯০,০০০ পাঃ, যে ক্ষেত্রে বিপ্লবের আগে এ অঙ্ক ১,২০০ পাঃ ছাড়িয়েছে কদাচিৎ। ডিউক অব লিড্‌স্ অভিযুক্ত হন ৫,০০০ পাঃ উৎকোচ গ্রহণের দায়ে, এবং ন্যায়পর রাজা স্বয়ং ১০,০০০ পাঃ নিয়েছেন বলে দোষী সাব্যস্ত হন। এই প্রত্যক্ষ উৎকোচ ছাড়াও প্রতিযোগী কোম্পানিগুলিকে বিতাড়িত করা হয়েছে নিম্নতম সুদে সরকারকে বিপুল টাকা ঋণদানের লোভ দেখিয়ে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ডিরেক্টরদের কিনে নিয়ে।

সরকারকে উৎকোচ-বশীভূত করে ক্ষমতা পায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যেমন পায় ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড, তা বজায় রাখতেও উৎকোচ দিতে বাধ্য হয় তারা, যেমন বাধ্য হয় ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড। একচেটিয়ার মেয়াদ ফুরোবার প্রতিটি পর্বেই সনদের মেয়াদ বৃদ্ধি এ কোম্পানি পায় কেবল সরকারকে নতুন ঋণ ও নতুন উপঢৌকন দিতে চেয়ে।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের (১০) ঘটনাবলীতে বাণিজ্য শক্তি থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিণত হয় সমর ও রাজ্য শক্তিতে। প্রাচ্যের বর্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় তখনই। ইস্ট ইন্ডিয়া স্টক উঠে গেল ২৬৩ পাউন্ডে আর ডিভিডেন্ট তখন দেওয়া হত শতকরা ১২—১/২ হারে। কিন্তু এবার দেখা দিল কোম্পানির নতুন এক শত্রু — প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী সংঘের রূপে নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রী ও প্রতিদ্বন্দ্বী জনগণের রূপে। বলা হল, কোম্পানির রাজ্য জয় করা হয়েছে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও ব্রিটিশ স্থল সৈন্যের সাহায্যে এবং কোনো ব্রিটিশ প্রজার ক্রাউন থেকে স্বাধীনভাবে সার্বভৌম রাজ্য থাকতে পারে না। শেষ যুদ্ধগুলিতে জেতার ফলে যে 'আশ্চর্য সম্পদ' লাভ হয়েছে বলে কল্পনা করা হয়েছিল তাতে ভাগ পাবার দাবি জানাল সেদিনের মন্ত্রীরা আর সেদিনের জনগণ। কোম্পানি তার অস্তিত্ব বাঁচায় ১৭৬৭ সালের এই চুক্তিতে যে, জাতীয় রাজকোষে সে বছরে দেবে ৪,০০,০০০ পাউন্ড।

কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চুক্তি পালন করার বদলে আর্থিক সংকটে জড়িয়ে পড়ে এবং ইংরেজ জনগণকে কর দেবার বদলে আর্থিক সাহায্যের প্রার্থনা জানায় পার্লামেন্টে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ অদল বদল হল সনদে। নতুন অবস্থা সত্ত্বেও কোম্পানির হাল উন্নত না হওয়ায় এবং যুগপৎ উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ জাতির উপনিবেশ খোয়া যাওয়ায় অন্যত্র কোনো একটা বৃহৎ উপনিবেশিক সাম্রাজ্য পুনর্লাভের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই সকলের কাছে অনুভূত হতে থাকে। খ্যাতনামা ফক্স ভাবলেন, তাঁর বিখ্যাত ইন্ডিয়া বিল আনার যোগ্য মুহূর্ত এসেছে ১৭৮৩ সালে, এ বিলে ডিরেক্টর ও প্রোপ্রাইটরদের কোর্ট বাতিল করে পার্লামেন্ট দ্বারা নিযুক্ত সাতজন কমিশনারের হাতে ভারত শাসনের গোটা ভার ন্যস্ত করার প্রস্তাব থাকে। লর্ড সভায় অপোগণ্ড রাজার* ব্যক্তিগত প্রভাবের জোরে মিঃ ফক্সের বিল পরাস্ত করা এবং ফক্স ও লর্ড নর্থের তদানীন্তন কোয়ালিশন সরকার ভেঙে দিয়ে সুবিখ্যাত পিটকে সরকারের নেতৃত্বে বসাবার উপলক্ষ্য হয়। ১৭৮৪ সালে পিট উভয় সভা থেকেই একটি বিল পাশ করিয়ে নেন যাতে প্রিভি কাউন্সিলের ছয়জন সভ্য নিয়ে একটি বোর্ড অব কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়, এই সভ্যদের কাজ ছিল :

'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূখণ্ড ও সম্পত্তি, রাজস্ব বা নাগরিক ও সামরিক শাসনের সঙ্গে এতটুকু সম্পর্কিত এমন সমস্ত কাজকর্ম ও ব্যবস্থার যাচাই, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা।'

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মিল বলেন :

'এ আইন পাশ করার পেছনে দুটি লক্ষ্য ছিল। মিঃ ফক্সের বিলের কু-উদ্দেশ্য বলে যা বলা হয়েছিল সে অভিযোগ এড়াবার জন্য দরকার ছিল যাতে দেখায় যেন প্রধান ক্ষমতা ডিরেক্টরদের হাতেই থাকছে। মন্ত্রিসভার সুবিধার দিক থেকে প্রয়োজন ছিল যাতে আসলে সে ক্ষমতা সবই নিয়ে নেওয়া যায়। প্রধানত এই প্রশ্নেই মিঃ পিটের বিল তাঁর পতিদ্বন্দ্বীর থেকে এই বলে তফাৎ ঘোষণা করতে চায় যে একটা বিলে ডিরেক্টরদের ক্ষমতা চূর্ণ করা হচ্ছিল, অন্য বিলে তা প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। মিঃ ফক্সের আইনে মন্ত্রীদের

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হত সোজাসুজি। মিঃ পিটের আইনে সে-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হল গোপনে ও শঠতা করে। ফক্সের বিলে কোম্পানির ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছিল পার্লামেন্ট-নিযুক্ত কমিশনারদের কাছে। মিঃ পিটের বিলে সে-ক্ষমতা দেওয়া হল রাজ-নিযুক্ত কমিশনারদের হাতে।' (১১)

১৭৮৩ ও ১৭৮৪ সালের বছরগুলিই তাই প্রথম এবং অদ্যাবধি একমাত্র বছর যখন ভারতীয় প্রশ্ন পরিণত হয় মন্ত্রিসভার প্রশ্নে। মিঃ পিটের বিল পাশ হওয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ নতুন করে দেওয়া হয় এবং কুড়ি বছরের জন্য সরিয়ে রাখা হয় ভারত প্রশ্ন। কিন্তু ১৮১৩ সালে অ্যান্টি-জ্যাকোবিন যুদ্ধ (১২) এবং ১৮৩৩ সালে সদ্যপ্রবর্তিত সংস্কার বিলের (১৩) তলে অন্য সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নই চাপা পড়ে।

তাই, প্রথমত এই কারণেই, ভারত প্রশ্ন ১৭৮৪ সালের আগে বা পরে একটা মস্ত রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারেনি, তার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সর্বাগ্রে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব অর্জন করতে হয়েছিল, তার পরে দায়িত্ব না নিয়ে তার যতটা ক্ষমতা গ্রাস করা সম্ভব তা চক্রতন্ত্র গ্রাস করে বসে, এবং তারো পরে সনদ নতুন করে দেওয়ার প্রতি পর্বে, ১৮১৩ সালে ও ১৮৩৩ সালে ইংরেজ জনগণ সর্বাধিক গুরুত্বের অন্য প্রশ্নে ব্যস্ত থাকে।

এবার অন্য দিক থেকে দেখা যাক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুরু করে কেবল তাদের এজেন্টদের কারখানা-কুঠি আর মাল রাখার গুদাম প্রতিষ্ঠা করে, তা রক্ষার জন্য কয়েকটা দুর্গ বানায় তারা। যদিও ১৬৮৯ সালেই তারা ভারতে একটা ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও রাজস্বকে তাদের আয়ের অন্যতম সূত্র করে তোলার কতা চিন্তা করেছিল তবু ১৭৪৪ সাল পর্যন্ত তারা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার আশেপাশের কিচু গুরুত্বহীন জেলাই কেবল অধিকার করে। পরে কর্ণাটকে যে যুদ্ধ বেধে যায় তার ফলে নানা সংগ্রামের পর তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতের ওই অঞ্চলটার সার্বভৌম প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। বাঙলায় যুদ্ধ এবং ক্লাইভের বিজয়ের ফলাফল হয় আরো প্রভূত। এর ফল হল সত্য করে বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যা অধিকার। ১৮শ শতাব্দীর শেষে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম বছরগুলিতে টিপু সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ বাধে এবং তার ফলে শক্তির বিরাট বৃদ্ধি এবং অধীনতামূলক ব্যবস্থার প্রভূত সম্প্রসারণ (১৪)। অবশেষে ১৯শ শতকের দ্বিতীয় দশকে জয় করা গেল প্রথম সুবিধাজনক যকটা সীমান্ত — মরুভূমি বরাবর ভারতের সীমান্ত। তার আগে পর্যন্ত প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এশিয়ার সেই সব অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছয়নি যা চিরকাল ভারতের প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো কেন্দ্রীয় শক্তির পীঠস্থান হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যের যেটি ভঙ্গুর জায়গা, পুরনো বিজয়ীরা যতবার বিতাড়িত হয়েছে নতুন বিজয়ীদের কাছে ততবার যেখান থেকে অভিযান এসেছে, সেই পশ্চিম সীমান্তের প্রাচীর ব্রিটিশের হাতে ছিল না। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৯ সালের পর্বে, শিখ ও আফগান যুদ্ধগুলির কালে পঞ্জাব ও সিন্ধুকে বলপূর্বক গ্রাস করে ব্রিটিশ শাসন পূর্ব ভারতীয় মহাদেশের নৃতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সীমানা জুড়ে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হল (১৫)। মধ্য এশিয়া থেকে আসা কোনো অভিযানী সৈন্যকে প্রতিহত করতে এবং পারস্য সীমান্তের দিকে রুশ অভিযানের বিরুদ্ধে এ অধিকার অপরিহার্য। এই শেষ দশকে ব্রিটিশ ভারতের ভূখণ্ডে যুক্ত হয়েছে ১,৬৭,০০০ বর্গ মাইল, যার অধিবাসী সংখ্যা ৮৫,৭২,৬৩০ জন। আর অভ্যন্তরে সব কটি দেশীয় রাজ্যই এখন ব্রিটিশ এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত, নানা ধরনের ব্রিটিশ স্মঞ্জপ্রঞ্জঁপ্রস্প্র-এর* অধীন ও একমাত্র গুজরাট ও সিন্ধু ছাড়া সমুদ্র উপকূল থেকে বিচ্ছিন্ন। বাইরের দিক থেকে ভারত এবার শেষ হল। একটি বৃহৎ ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কেবল ১৮৪৯ সাল থেকেই।

এই ভাবে কোম্পানির নামের আড়ালে ব্রিটিশ সরকার দুই শতক ধরে লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত পৌঁচিয়েছে। এবার বুঝতে পারি, কেন এই সারাটা সময় ইংলন্ডের সব পার্টিই, এমন কি কপট শান্তি স্তরে যারা মুখরতম হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারাও একটি বৃহৎ ভারত সাম্রাজ্যের arrondissement* সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চোখ ঠেরে চুপ করে ছিল। প্রথমত, তাদের তীব্র জনহিতৈষণার প্রয়োগ করতে হলে সে সাম্রাজ্যটা আগে অবশ্যই পাওয়া চাই। এই দিক থেকে সনদ নবায়নের আগের সমস্ত পর্বের তুলনায় বর্তমান বছরে, ১৮৫৩ সালে ভারত প্রশ্নের পরিবর্তিত অবস্থার কথা আমরা বুঝতে পারি।

ফের আবার অন্যদিক থেকে দেখা যাক। বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ধারা পর্যালোচনা করলে আমরা ভারত বিধানের বিশিষ্ট সংকটটিকে আরো ভালো করে বুঝতে পারব।

এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কারবার শুরুর সময় ভারতের সঙ্গে লাভজনকভাবে বাণিজ্য চালাবার জন্য কোম্পানি বছরে ৩০,০০০ পাউন্ড মূল্যের সোনা, রূপা ও বৈদেশিক মুদ্রা রপ্তানি করার অনুমতি পায়। এ ঘটনা সে যুগের সবকিছু কুসংস্কার বিরোধি এবং টমাস মান তাঁর (A Discourse of Trade, from England unto the East-Indies) পুস্তকে (১৬) 'বাণিজ্য ব্যবস্থা'র বনিয়াদ দিতে বাধ্য হন এই কথা স্বীকার করে যে, মহার্ঘ ধাতুই দেশের একমাত্র সম্ভব সত্যকার সম্পদ, যদিও সেই সঙ্গেই যুক্তি দেন যে তার রপ্তানি নিরাপদে অনুমোদন করা যায় যদি ব্যালান্স অব পেমেন্ট হয় রপ্তানিকারী দেশের অনুকূল। এই অর্থে তিনি বলতে চান যে পূর্ব ভারত থেকে আমদানি করা পণ্য প্রধানত ফের-চালান যায় অন্যান্য দেশে, ফলে ভারতে তার দাম দেবার জন্য যে স্বর্ণ ও রূপা ব্যয় করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ স্বর্ণ ও রূপা পাওয়া যায়। একই প্রেরণায় স্যার জোসিয়া চাইল্ড লিখেছিলেন তাঁর (A Treatise Wherein Is Demonstrated I. That the East-India Trade Is the Most National of All Foreign Trades) (১৭)। ক্রমে ক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর্থনকারীরা আরো স্পর্ধিত হয়ে ওঠে এবং এই বিচিত্র ভারত ইতিহাসের একটা কৌতূহলের বিষয় হিসাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ভারতস্থিত একচেটিয়া মালিকেরাই ইংলন্ডে অবাধ বাণিজ্যের প্রথম প্রচারক।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রসঙ্গে পার্লামেন্টি হস্তক্ষেপের দাবি ফের ওঠে ব্যবসায়ী শ্রেণির কাছ থেকে নয়, শিল্পজীবী শ্রেণির কাছ থেকে ১৭শ শতকের শেষ ও ১৮শ শতকের বেশির ভাগ কাল জুড়ে, যখন পূর্ব ভারতের সুতি ও পশমি বস্ত্র বেচারা ব্রিটিশ কারখানা মালিকদের ধ্বংস করছে বলে ঘোষণা করা হয় — এ মত প্রকাশিত হয় জন পোলেক্সফেনের খ্যঁ%দ্মঁ নুঁ ম্নক্ষস্ক্ষ্ঁ ঔঁ=ক্ষক্ষস্প্রঁস্ন্গঁ ৯প্রত্র ন্ঁশ্বস্ত্রপ্রক্ষ) ্ল=ঁ=ঁষ ৃদ্বঞ্জঙ (১৮) যা অদ্ভুতভাবে সত্য প্রমাণিত হয় দেড় শতাব্দী পরে, কিন্তু অতি ভিন্ন একটা অর্থে। পার্লামেন্ট তখন হস্তক্ষেপই করে। তৃতীয় উইলিয়ম, ১১ ও ১২ অ্যাক্ট, ক্যাপশন ১০ আইন বলে ভারত, পারস্য ও চিন থেকে আমদানি করা রেশমি বস্ত্র ও ছাপা বা রঙ-করা ক্যালিকো পরা নিষিদ্ধ হল ও তার পরিধানকারী বা বিক্রয়কারী সকলের উপরেই ২০০ পাউন্ড জরিমানা ধার্য হল। পরে যাঁরা 'আলোকপ্রাপ্ত' হয়ে ওঠেন সেই ব্রিটিশ মাল উৎপাদকদের বারম্বার বিলাপে ১ম, ২য় ও ৩য় জর্জের আমলেও অনুরূপ আইন হয়। এই ভাবে ১৮শ শতকের বেশির ভাগটা ধরে ভারতের মাল ইংলন্ডে সাধারণত আমদানি করা হত ইউরোপিয় মহাদেশে বিক্রয়ের জন্য এবং খাস ইংলন্ডের বাজার থেকে তা বাদ দিয়ে রাখার জন্য।

লুব্ধ দেশিয় শিল্পপতিদের প্রার্থিত পার্লামেন্টের এই পূর্ব ভারতীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াও সনদ নবায়নের প্রতি পর্বেই লন্ডন, লিভারপুল ও ব্রিস্টলের ব্যবসায়ীরা কোম্পানির বাণিজ্য একচেটিয়া ভেঙে ভাগ নেবার চেষ্টা করে সেই বাণিজ্যে, যা ধরা হত এক খাঁটি স্বর্ণখনি বলে। এই সব প্রচেষ্টার ফলে ১৭৭৩ সালের আইনে কোম্পানির সনদ ১৮১৪ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এই ব্যবস্থা করা হল যাতে প্রায় সব রকমের পণ্যই কোম্পানি বহির্ভূত ব্যক্তিবিশেষ ইংলন্ড থেকে রপ্তানি এবং কোম্পানির ভারতীয় কর্মচারীরা ইংলন্ডে আমদানি করার অধিকার পায়। কিন্তু এই সুবিধাদান এমন সব শর্ত দিয়ে বাঁধা হয় যাতে ব্রিটিশ ভারতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের রপ্তানির ক্ষেত্রে তার কোনো ফল পড়ল না। ১৮১৩ সালে সাধারণ বাণিজ্যের চাপ কোম্পানি আর আটকাতে পারল না এবং চিন বাণিজ্যের একচেটিয়া ব্যতীত ভার বাণিজ্য কতকগুলি শর্তে উন্মুক্ত হল সাধারণ প্রতিযোগিতায়। ১৮৩৩ সালে সনদ নবায়নের সময় শেষ পর্যন্ত এই বাকি প্রতিবন্ধকগুলিও নাকচ হয়, আদৌ কোনোরূপ বাণিজ্য চালানো কোম্পানির নিষিদ্ধ হয়, চূর্ণ হয় তাদের বাণিজ্যিক সত্তা, ভারত ভূমি থেকে ব্রিটিশ প্রজা বহিষ্কৃত রাখার অধিকার তাদের কেড়ে নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে পূর্ব ভারতীয় বাণিজ্যে কতকগুলি গুরুতর বিপ্লব ঘটে, তাতে সে বাণিজ্য প্রসঙ্গে ইংলন্ডের বিভিন্ন শ্রেণিস্বার্থের অবস্থান-ভঙ্গি একেবারে বদলে যায়। গোটা ১৮শ শতক ধরে ভারত থেকে ইংলন্ডে যে ধন প্রেরিত হয় তা অর্জিত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত নগণ্য বাণিজ্যের দরুন ততটা নয়, যতটা সে দেশের প্রত্যক্ষ

শোষণের দরুন, এবং যে বিপুল ঐশ্বর্য জোর করে আদায় করে ইংলন্ডে পাচার করা হয়েছিল তার দরুন। ১৮১৩ সালে ভারত বাণিজ্য উন্মুক্ত হওয়ার কিছু কাল মধ্যেই তা তিন গুণেরও বেশি বেড়ে ওঠে। কিন্তু এই সব নয়। বাণিজ্যের গোটা চরিত্রই বদলে যায়। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারত ছিল প্রধানত রপ্তানিকারী দেশ আর এখন সে হয়ে দাঁড়াল আমদানিকারক, এবং এমন দ্রুত গতিতে যে, ১৮২৩ সালেই যে বিনিময় হার ছিল সাধারণত টাকায় ২ শিঃ ৬ পেঃ তা নেমে গেল ২ শিলিঙে। অবিস্মরণীয় কাল থেকে দুনিয়ার সূতিমালের বৃহৎ কারখানা ভারতবর্ষ এবার ভেসে গেল ইংরেজি টুইস্ট ও সুতিবস্ত্রে। ভারতের নিজস্ব উৎপন্নকে ইংলন্ড থেকে বহিষ্কৃত করা বা কেবল অতি কঠোর শর্তে প্রবেশানুমতি দেবার পর ব্রিটিশ কারখানা-মাল অল্প এবং নামামাত্র শুল্কে প্লাবিত হতে থাকল ভারতে যার ফলে তার একদা অতো বিখ্যাত দেশীয় সুতিবস্ত্রের ধ্বংস। ১৭৮০ সালে ব্রিটিশ উৎপন্ন ও কারখানা-মালের মূল্য ছিল মাত্র ৩,৮৬,১৫২ পাঃ, সেই বছরেই রপ্তানি বুলিয়নের পরিমাণ ছিল ১৫,০৪১ পাঃ এবং ১৭৮০ সালে রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ১,২৬,৪৮,৬১৬ পাঃ অর্থাৎ ভারত বাণিজ্য ছিল গোটা বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্র ১/৩২ ভাগ। ১৮৫০ সালে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যান্ড থেকে ভারতে রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল ৮০,২৪,০০০ পাঃ, যার মধ্যে শুধু সুতিবস্ত্রের পরিমাণ ৫২,২০,০০০ পাঃ, অর্থাৎ মোট রপ্তানির ১/৮ ভাগের বেশি এবং বৈদেশিক সুতি বাণিজ্যের ১/৪ অংশেরও বেশি। কিন্তু সুতি মাল উৎপাদনেও এখন ব্রিটেনের ১/৮ ভাগ লোক নিযুক্ত এবং তা থেকে আসছে সমগ্র জাতীয় আয়ের ১/১২ ভাগ। প্রত্যেকটা বাণিজ্য সংকটেই পূর্ব ভারতীয় বাণিজ্য ব্রিটিশ সুতি কারখানা মালিকদের পক্ষে হয়ে উঠেছে ক্রমেই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পূর্ব ভারতীয় মহাদেশ হয়েছে আসলে তাদের সেরা বাজার। যে হারে সুতি মাল উৎপাদন হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রিটেনের গোটা সমাজ কাঠামোর পক্ষে মূল স্বার্থ ঠিক সেই হারেই পূর্ব ভারতও হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রিটিশ সুতি মাল উৎপাদনের পক্ষে মূল স্বার্থ।

যে টাকা-ওয়ালারা ভারতকে তার ভূসম্পত্তিতে পরিণত করেছে, যে চক্রতন্ত্র তাকে জয় করেছে তার সৈন্য দিয়ে আর যে কল-ঢয়ালারা তাকে প্লাবিত করেছে তার বস্ত্রে, তাদের স্বার্থ ততদিন পর্যন্ত হাতে হাত দিয়েই চলেছে। কিন্তু শিল্প স্বার্থ যতই ভারতীয় বাজারের ওপর নির্ভরশীল হতে থাকে, ততই ভারতের দেশীয় শিল্প ধ্বংস করার পর ভারতে নতুন উৎপাদনী শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করতে শুরু করে। তৈরি মাল দিয়ে একটা দেশকে ক্রমাগত প্লাবিত করে চলা যায় না, যদি না পরিবর্তে কিছু উৎপন্ন বিনিময় করার সামর্থ্য সে দেশকে দেওয়া যায়। শিল্প স্বার্থ দেখল, বাড়ার বদলে বাণিজ্য তাদের কমছে। ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত চার বছরে গ্রেট বৃটেন থেকে ভারতে আমদানির পরিমাণ ২৬.১ কোটি টাকা, ১৮৫০ সাল পর্যন্ত পরের চার বছরে সে পরিমাণ মাত্র ২৫.৩ কোটি টাকা, আর প্রথম পর্বে (ভারত থেকে) রপ্তানি ছিল ২৭.৪ কোটি টাকা, পরের পর্বে ২৫.৪ কোটি। তারা দেখল তাদের মাল পরিভোগের ক্ষমতা ভারতে সর্বনিম্ন মাত্রায় সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, অধিবাসীদের মাথা পিছু হিসাবে তাদের মাল পরিভোগের পরিমাণ দাঁড়ায় ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রায় ১৪ শিঃ, চিলিতে ৯ শিঃ ৩ পেঃ, ব্রেজিলে ৬ শিঃ ৫ পেঃ, কিউবায় ৬ শিঃ ২ পেঃ, পেরুতে ৫ শিঃ ৭ পেঃ, মধ্য আমেরিকায় ১০ পেঃ, অথচ ভারতে তা মাত্র ৯ পেঃ। তারপর দেখা দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ফসলের ঘাটতি, ১৮৫০ সালে যাতে তাদের ক্ষতি হয় ১,১০,০০,০০০ পাঃ, ইস্ট ইন্ডিজ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা তুলার জোগান না থাকায় আমেরিকার ওপর নির্বর করতে হচ্ছে বলে তারা ব্যাজার। তাছাড়া তারা দেখল ভারতে পুঁজি ঢালার চেষ্টা করলেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবন্ধকতা ও ঘোর প্যাঁচের সম্মুখীন হতে হয়। এইভাবে একদিকে শিল্প স্বার্থ এবং অন্যদিকে টাকা-ওয়ালা ও চক্রতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ভারত পরিণত হল রণক্ষেত্রে। কারখানা মালিকেরা ইংলন্ডে তাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের সচেতনতায় এবার দাবি করছে ভারতে এই প্রতিবন্ধক শক্তিগুলির ধ্বংস, ভারত শাসনের গোটা সাবেকি ব্যবস্থাটার বিনাশ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চূড়ান্ত বিলোপ।

এবার চতুর্থ ও শেষ আর একটা দিক থেকে ভারত প্রশ্ন বিচার্য। ১৭৮৪ সাল থেকে ভারতের অর্থসঙ্গতি ক্রমাগত সংকটে পড়েছে। বর্তমানে তার জাতীয় ঋণ ৫ কোটি পাঃ, চলেছে রাজস্বের উৎসগুলির ক্রমাগত হ্রাস ও ব্যয়ের তেমনি বৃদ্ধি যা অনিশ্চিতরূপে ঠেকা দেওয়া হয়েছে আফিম করের জুয়াড়ি আয় দিয়ে,

বর্তমানে তা আবার চিনাদের নিজস্ব পোস্ত চাষ শুরুতে বিপন্ন, তাছাড়া নিরর্থক ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৯) আশঙ্কিত খরচায় এ ব্যয় বাড়বে।

মিঃ ডিকিনসন বলছেন, 'অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, ভারতের সাম্রাজ্য খোয়া গেলে ইংলন্ড ধ্বংস পাবে বলে সে সাম্রাজ্য রাখার জন্য আমাদের নিজস্ব অর্থসঙ্গতিকেই ধ্বংসে টানা হচ্ছে।' (২০)

এইভাবে দেখালাম, ১৭৮৩ সালের পর ভারতীয় প্রশ্ন কীভাবে এই প্রথম ইংলন্ডের প্রশ্ন, মন্ত্রিসভার প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩ সালের সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
২৪ জুন লিখিত New-York Daily Tribune
পত্রিকার ৩৮১৬ নং সংখ্যায় ১৮৫৩ সালের
১১ জুলাই প্রকাশিত
স্বাক্ষর : কার্ল মার্কস

* বড় ধনপতিদের — সম্পাঃ।
* তৃতীয় জর্জ — সম্পাঃ।
* আধিপত্যের — সম্পাঃ।
* পরিসীমা — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল

লন্ডন, শুক্রবার, ২২ জুলাই, ১৮৫৩

এ চিঠিতে আমি ভারত সম্পর্কে আমার মন্তব্যের উপসংহার টানতে চাই। ইংরেজ প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল কি করে? মহা মোগলদের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভেঙে ফেলেছিল মোগল শাসনকর্তারা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করল মারাঠারা (২১)। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা; এবং সবাই যখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন প্রবেশ করল বৃটেন এবং সকলকে অধীন করতে সক্ষম হল। দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রম-জাতিভেদে; এমন একটা স্থিতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা এসেছে সমাজের সভ্যদের মধ্যস্থ একটা পারস্পরিক বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে; — এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই? বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না, এবং তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোনো ইতিহাসই নেই — অন্তত জানা কোনো ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ওই অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে। ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরেজের ছিল কিনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন এই, আমরা কি চাই তুর্কি, পারসিক কি রুশদের দ্বারা ভারত-বিজয়, নাকি বৃটনদের দ্বারা ভারত-বিজয়?

ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলন্ডকে, একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক — পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।

আরবি, তুর্কি, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই হিন্দু-ভূত হয়ে গেছে, ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের

উন্নততর সভ্যতায়। ব্রিটিশেরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু অনধিগম্য। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, স্থানীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং স্থানীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে ব্রিটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া লক্ষ্যেই প্রায় পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এ উজ্জীবনের প্রথম শর্ত হল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য — মোগল-ই আজম আমলের চেয়েও তা বেশি সংহত ও দূর প্রসারিত। ব্রিটিশ তরবারি দ্বারা আরোপিত সেই ঐক্য এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে। দেশীয় যে সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশ ড্রিল-সার্জেন্টদের দ্বারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্ম-মুক্তির এবং বহিরাগত যে কোনো আক্রমণকারীর শিকার হওয়া থেকে অব্যাহতির স্কুঁপ্র ভ্রু ঁ ঁ=। এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইউরোপীয়ের সাধারণ যুগ্ম সন্তানদের দ্বারা যা প্রধানত পরিচালিত সেই স্বাধীন সংবাদপত্র পুনর্নির্মাণের এক অভিনব ও শক্তিশালী কারিকা। যত ঘৃণ্যই হোক, জমিদারি ও রায়তোয়ারি (২২) হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপ — এশীয় সমাজের মহান লুপ্তসূত্র হল এইটে। কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণি গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ এনে দিয়েছে বাষ্প, ভারতেরপ রধান প্রধান বন্দরগুলিকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব মহাসমুদ্রের বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং ভারতের অচলায়তনের যা প্রাথমিক কারণ, সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে তাকে পুনরুত্থিত করেছে। সেদিন দূরে নয়, যখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলন্ডে মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা-রূপকথার দেশটা এই ভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভারতের প্রগতিতে এতদিন পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনের শাসক শ্রেণিগুলির যা স্বার্থ ছিল সেটা নিতান্ত আকস্মিক, অস্থায়ী ও ব্যতিরেকমূলক। অভিজাত শ্রেণি চেয়েছিল জয় করতে, ধনপতিরা চেয়েছিল লুন্ঠন, এবং মিল-তন্ত্রীরা চেয়েছিল শস্তায় বেচে বাজার দখল। এখন দান উলটে গেছে। মিল-তন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছে যে উৎপাদনশীল দেশরূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরি এবং সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও আভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের ওপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা। এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।

এ কথা অতি সুবিদিত যে, ভারতের উৎপাদনী শক্তি পঙ্গু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদন-দ্রব্যের পরিবহন ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। বৃটিশ কমন্স সভার ১৮৪৮ সালে গঠিত একটি কমিটির কাছে প্রমাণিত হয়েছিল যে, ‘খান্দেশে যখন এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রি হচ্ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং মূল্যে তখন পুনায় তা বিক্রি হচ্ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং দামে — সেখানে লোকে দুর্ভিক্ষে মরে পড়ে থাকছিল রাস্তায়, খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কেননা কাঁচা রাস্তায় গাড়ি অচল।’

যেখানে রেলপথ-বাঁধের প্রয়োজনে মাটি দরকার সেখানে পুকুর খুঁড়ে এবং বিভিন্ন লাইন বরাবর জল সরবরাহ করে রেলওয়ের প্রবর্তনকে সহজেই কৃষি-উদ্দেশ্যের সহায়ক করে তোলা সম্ভব। এই ভাবে প্রাচ্যের চাষ ব্যবস্থার যা অপরিহার্য শর্ত সেই সেচ ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত করা যেতে পারে এবং জলাভাবে বারবার দেখা-দেওয়া স্থানীয় দুর্ভিক্ষগুলিকে রোধ করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলওয়ের সাধারণ গুরুত্ব স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি এমন কি (পশ্চিম-ঘাট পূর্ব-) ঘাটের নিকটবর্তী জেলাগুলিতে সেচহীন জমিগুলির তুলনায় সেচ-দেওয়া জমিগুলির কর তিন গুণ, কর্মসংস্থান দশ-বারো গুণ এবং মুনাফা বারো থেকে পনেরো গুণ বেশি।

রেলওয়ের ফলে সামরিক ব্যবস্থার আয়তন ও ব্যয় কমানোর উপায় হবে। ফোর্ট সেন্ট উইলিয়মের টাউন মেজর কর্ণেল ওয়ারেন কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট বলেন :

'বতর্মানে যত দিন এমন কি যত সপ্তাহ দরকার হয়, মাত্র তত ঘণ্টার মধ্যেই দেশের দূর অঞ্চল থেকে সংবাদ পেয়ে যাওয়া এবং আরো কম সময়ের মধ্যে সৈন্য ও রসদসহ নির্দেশ প্রেরণের সম্ভাব্যতা, এ বিবেচনা একটুও ছোটো করে দেখা চলে না। বর্তমান অপেক্ষা আরো দূরবর্তী ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলিতে সৈন্যদের রাখা যাবে এবং এতে করে রোগজনিত জীবনহানি বহু পরিমাণে কমানো যাবে। বিভিন্ন ডিপোতে রসদের ততটা প্রয়োজন থাকতে পারে না, এবং জলবায়ুর কারণে রসদের ক্ষয়ক্ষতি ও নাশ পরিহার করা সম্ভব হবে। সৈন্যবাহিনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমানো যাবে সৈন্যসংখ্যা।'

আমরা জানি, গ্রাম গোষ্ঠীগুলির পৌর সংগঠন ও আর্থনীতিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু এগুলির যা সর্বমন্দ দিক — বাঁধিগৎ ও বিচ্ছিন্ন টুকরোয় সমাজের বিচূর্ণীভবন, সেটার প্রাণশক্তি এখনো বজায়। গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্টি ভারতে পথঘাটের অভাব এবং পথঘাটের অভাবের ফলে গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা হয়েছে চিরস্থায়ী। নিম্নতম মাত্রার সুযোগসুবিধার ওপর, গ্রাম গ্রামান্তরের সঙ্গে প্রায় কোনো যোগাযোগ ছাড়াই এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যে যা অপরিহার্য তেমন আকাংক্ষা ও প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই এক একটি গোষ্ঠী বেঁচে এসেছে এই ছকের ওপর। গ্রামগুলির এই স্ব-পর্যাপ্ত জাড্য ভেঙে দিয়েছিল ব্রিটিশেরা, রেলপথ যোগাবে যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের নতুন অভাববোধ। তাছাড়া,

'রেলপথ ব্যবস্থার অন্যতম ফল হবে — রেলপথ-প্রভাবিত প্রত্যেকটি গ্রামে অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারিগরির জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান লাভের উপায় সুলভ হবে, তার ফলে ভারতের বংশানুক্রমিক ও বৃত্তিভোগী গ্রাম্য কারিগর প্রথমত তার পুরো যোগ্যতার প্রমাণ পাবে এবং অতঃপর তার ত্রুটি দূরীকরণের সাহায্য হবে' বচ্যাপম্যান, 'ভারতের তূলা ও বাণিজ্য' (২৩)।

আমি জানি যে ইংরেজ মিল-তন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তূলা ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় (locomotion) যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্পকারখানার ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। এ যে নিশ্চয় তা আরো স্পষ্ট এই কারণে যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করছে, একেবারে নতুন ধরনের শ্রম-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যন্ত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার মতো বিশেষ যোগ্যতা হিন্দুদের আছে। কলকাতা টাঁকশালে যে দেশীয় ইঞ্জিনিয়ররা অনেক বছর ধরে বাষ্পীয় যন্ত্রে কাজ করছেন তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, হরিদ্বার কয়লা অঞ্চলে কতকগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণ এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে এ ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুসংস্কারে ভয়ানক প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ক্যামবেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত শিল্প-ক্ষমতা বর্তমান, পুঁজি সঞ্চলের মতো যোগ্যতা তাঁদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাঁদের মাথা পরিচ্ছন্ন এবং গণনা ও গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাঁদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্য।' উনি বলছেন, 'এঁদের মেধা চমৎকার।' (২৪)

রেল ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত আধুনিক শিল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক যে ভাগাভাগির ওপর ভারতের জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভেঙে পড়বে।

ইংরেজ বুর্জোয়ারা হয়ত বা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না — এগুলি শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ওপরেই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের স্বত্ব-গ্রহণের ওপরেও নির্ভরশীল। কিন্তু এ দুটি জিনিসের জন্যেই বৈষয়িক পূর্বশর্ত স্থাপনের কাজ

ইংরেজ বুর্জোয়ারা না করে পারবে না। তার বেশি কি বুর্জোয়ারা কখনো কিছু করেছে? রক্ত আর কাদা, দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোনো অগ্রগতি ঘটিয়েছে?

খাস গ্রেট বৃটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসক শ্রেণি স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না। যাই হোক, ন্যূনাধিক সুদূর ভবিষ্যতে আশা করতে পারি, দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন, সেই দেশ যেখানকার শিষ্ট দেশবাসীরা — প্রিন্স সালতিকভের ভাষায় — এমন কি হীনতম শ্রেণিগুলিও (plus fins et plus adroits que les Italiens) যাদের পরাধীনতাও এক ধরনের শান্ত মহত্ত্ব দ্বারা সহনীয় (counter balanced), স্বাভাবিক অনীহা সত্ত্বেও যারা ব্রিটিশ অফিসারদের চমৎকৃত করেছে তাদের সাহস দেখিয়ে, যাদের দেশটা হল আমাদের ভাষা ও আমাদের ধর্মের উৎসভূমি, এবং যাদের জাটদের মধ্যে আমরা পাই প্রাচীন জার্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের জাতিরূপ।

উপসংহারের কিছু মন্তব্য না দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে ছে টানতে পারছি না।

স্বদেশে যা ভদ্রূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গি বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত। ওরা সম্পত্তির সমর্থক, কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে যে রকম কৃষি বিপ্লব হল তেমন কৃষি বিপ্লব কি কোনো বৈপ্লবিক দল কখনো সৃষ্টি করেছে? দস্যুচূড়ামণি স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের ভাষায়, ভারতবর্ষে যখন সাধারণ দুর্নীতি ওদের লালসার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবরদস্তির পথ নেয়নি? জাতীয় ঋণের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেন্ট বাজেয়াপ্ত করেনি — কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যে রাজারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল? 'আমাদের পবিত্র ধর্ম' রক্ষার অছিলায় ওরা যখন ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন একই সময়ে কি তারা ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়নি, এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলিতে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্যে জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকাবৃত্তির ব্যবসায় চালায়নি? সম্পত্তি, শৃঙ্খলা, পরিবার ও ধর্মের' পুরোধা হল এরাই।

ইউরোপ-সদৃশ বিপুল, ১৫ কোটি একর এক ভূখণ্ডের দেশ ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে দেখলে ব্রিটিশ শিল্পের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া সুস্পসএবং হতভম্ব করার মতো। কিন্তু ভোলা উচিত নয়, বর্তমানে যে-ভাবে সমগ্র উৎপাদন সংগঠিত, ও হল তারই অঙ্গাঙ্গি ফলাফল। এ উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির চূড়ান্ত প্রভুত্বের ওপর। স্বাধীন শক্তি হিসাবে পুঁজির অস্তিত্বের জন্যে পুঁজির কেন্দ্রীভবন অপরিহার্য। বর্তমানে প্রতিটি সুসভ্য শহরে অর্থনীতিশাস্ত্রের যে অন্তর্নিহিত অঙ্গাঙ্গি নিয়মগুলি কাজ করছে, বিশ্বের বাজারের ওপর এ কেন্দ্রীভবনের বিধ্বংসী প্রভাব শুধু সেগুলোকেই উদ্‌ঘাটিত করছে বিপুলতম আকারে। ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা — একদিকে মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়, অন্যদিকে মানুষের উৎপাদনী শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যরূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে এক নতুন জগতের বৈষয়িক শর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদনী শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব আত্মস্থ করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩ সালের ২২ জুলাই লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে

New-York Daily Tribune পত্রিকার ৩৮৪০ নং সংখ্যায়
১৮৫৩ সালের ৮ আগস্ট প্রকাশিত
স্বাক্ষর : কার্ল মার্কস

* অপরিহার্য শর্ত — সম্পাঃ।
* 'ইতালিয়দের চেয়ে মার্জিত ও পারদর্শী।' আ. দ. সালতিকভের বই Lettres sur l'Inde, Paris, 1848, p. 61 থেকে মার্কসের উদ্ধৃতি — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ (২৫)

প্রায় দেড়শ বছর ধরে গ্রেট বৃটেন তার ভারত সাম্রাজ্যের মেয়াদ বজায় রাখার অপচেষ্টা করেছে যে মহা সূত্রে সেটি হল রোমানদের divide et impera* বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বর্ণাশ্রম, ধর্মবিশ্বাস ও সার্বভৌমদের যে যোগফল থেকে গড়ে উঠেছে ভারত নামের ভৌগোলিক ঐক্য তাদের পরস্পর বৈরিতাই ব্রিটিশ প্রাধান্যের মূল নীতি হয়ে এসেছে। পরবর্তী কালে অবশ্য সে প্রাধান্যের পরিস্থিতিতে বদল হয়েছে। সিন্ধু ও পঞ্জাব বিজয়ের পর ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্য শুধু তার স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত পৌঁছল তাই নয়, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের শেষ চিহ্নও পদদলিত হল। যুদ্ধপ্রিয় সমস্ত দেশীয় উপজাতিদের দমন করা হল, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের অবসান হল এবং অযোধ্যার বিগত সাম্রাজ্য-ভুক্তিতে (২৬) ভালো করেই প্রমাণিত হল যে, তথাকথিত স্বাধীন ভারতীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব-নিতান্তই অনুমতি-সাপেক্ষ। সুতরাং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থায় প্রভুত বদল হয়েছে। এখন আর ভারতের এক অংশের সহায়তায় অন্য অংশকে তা আক্রমণ করে না, সে নিজেই এখন সর্বপ্রধান, গোটা ভারত তার পদতলে। আর জয় করার কাজ নেই বলে এ এখন হয়ে উঠেছে দেশের একমাত্র বিজয়ী। তার সৈন্যদলের কাজ এখন আর রাজ্যবিস্তার নয়, রাজ্যটাকেই কেবল বজায় রাখা। সৈন্য থেকে তারা পরিণত হয়েছে পুলিসে, ২০ কোটি দেশীয়রা দমিত হচ্ছে ২ লাখ লোকের এক দেশীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা, যাদের অফিসাররা সব ইংরেজ, আর এই দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে আবার সংযত করে রাখছে মাত্র ৪০,০০০ লোকের এক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী। প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় জনগণের আনুগত্য নির্ভর করছে এই যে দেশীয় সৈন্যবাহিনীর বিশ্বস্ততার ওপর, তা গড়ে তুলে ব্রিটিশ রাজ সেই সঙ্গেই ভারতীয় জনগণের জন্য এই সর্বপ্রথম একটা সাধারণ প্রতিরোধ-কেন্দ্র সংগঠিত করে বসে। এই দেশীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর কতোটা ভরসা করা যায় তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক বিদ্রোহগুলিতে — পারস্যের যুদ্ধের ফলে (২৭) বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে ইউরোপীয় সৈন্য প্রায় শূন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর আগেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু বর্তমান বিদ্রোহ (২৮) কতকগুলি বৈশিষ্টসূচক ও মারাত্মক লক্ষণে চিহ্নিত। এই প্রথম সিপাহী বাহিনী হত্যা করল তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের, মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে, 'হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লির হিংসাহনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে,' বিদ্রোহ শুধু কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এবং পরিশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ মিলে গেছে ইংরেজ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো এশীয় জাতিগুলির এক সাধারণ অসন্তোষের সঙ্গে, বেঙ্গাল আর্মির বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে পারস্য ও চিন যুদ্ধের সঙ্গে (২৯) ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।

চার মাস আগে বেঙ্গাল আর্মিতে যে অসন্তোষ ছড়াতে শুরু করে তার তথাকথিত কারণ হল দেশীয়দের মনে এই আশঙ্কা যে, সরকার বুঝি তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে। যে কার্তুজ বিলি করা হয় তা নাকি ষাঁড় ও শুয়রের চর্বি মাখানো কাগজে তৈরি, সুতরাং তা দাঁতে কাটলে ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে বলে দেশীয়রা মনে করে — এই কার্তুজ বিলি থেকে আঞ্চলিক হাঙ্গামার সঙ্কেত। ২২ জানুয়ারি

কলকাতা থেকে কিছু দূরের এক ক্যান্টনমেন্টে অগ্নিপ্রদানের ঘটনা ঘটে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯ নং দেশীয় রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বহরমপুরে, কার্তুজ নিতে আপত্তি করে সৈন্যরা। ৩১ মার্চ এ রেজিমেন্টকে ভেঙে দেওয়া হয়, মার্চের শেষে বারাকপুরে অবস্থিত ৩৪ নং সিপাহী রেজিমেন্ট এইটে হতে দেয় যে, একটি সৈন্য গুলি ভরা মাস্কেট নিয়ে লাইনের সামনে প্যারেডের ময়দানে এগিয়ে গেল ও সাথীদের বিদ্রোহে আহ্বান করে রেজিমেন্টের অ্যাডজুটেন্ট ও সার্জেন্ট-মেজরকে আক্রমণ ও আহত করতে পেল। এতে যে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়, তাতে শত শত সিপাই নিষ্ক্রিয়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখে আর বাকিরা লড়াইয়ে যোগ দিয়ে বন্দুকের কুঁদা দিয়ে আক্রমণ করে অফিসারদের। পরে এ বাহিনীটিকেও ভেঙে দেওয়া হয়। এপ্রিল মাস চিহ্নিত হল এলাহাবাদ, আগ্রা, আম্বালায় বেঙ্গল আর্মির কতিপয় ক্যান্টনমেন্টে অগ্নিপ্রদানের ঘটনায়, মিরাটে হালকা ঘোড়সওয়ারীদের ৩য় রেজিমেন্টের বিদ্রোহে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই আর্মিতে অনুরূপ অসন্তোষের আবির্ভাবে। মে-র গোড়ায় অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌতে একটি বিদ্রোহের থুপ্রঁপ্রস্প্রঙ তোড়জোড় হয়, কিন্তু স্যার এইচ. লরেন্সের তৎপরতায় তা বন্ধ হয়। বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দিয়ে ৯ মে মিরাটের ৩য় হালকা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বিদ্রোহীদের মার্চ করিয়ে ঢোকানো হয় জেলে। পরের দিন সন্ধেবেলায় ৩য় ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সৈন্যরা ১১ নং ও ২০ নং-এর দেশীয় দুটি রেজিমেন্ট সহ কুচকাওয়াজের মাঠে জমায়েত হয়ে শান্ত করতে আসা অফিসারদের হত্যা করে, ক্যান্টনমেন্টে আগুল লাগিয়ে দেয় ও যাকে পায় তেমন সমস্ত ইংরেজকেই খুন করে। এ ব্রিগেডের ব্রিটিশ অংশটা এক রেজিমেন্ট পদাতিক, এক রেজিমেন্ট ঘোড়সওয়ার এবং ঘোড়াটানা ও পদাতিক গোলন্দাজদের একটা বিপুল শক্তি জড়ো করতে পারলেও রাত হওয়া পর্যন্ত তারা এগোতে পারেনি। বিদ্রোহীদের সামান্যই ক্ষতি করে তারা, খোলা মাঠ ধরে মিরাট থেকে গোটা চল্লিশেক মাইল দূরে দিল্লির ওপর চড়াও হতে তাদের দেয়। সেখানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় সৈন্যাবাস, যাতে ছিল ৩৮ নং, ৫৪ নং ও ৭৪ নং পদাতিক রেজিমেন্ট এবং দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীর একটি কোম্পানি। আক্রান্ত হয় ব্রিটিশ অফিসাররা, হাতের কাছের সমস্ত ইংরেজ খুন হয় ও দিল্লির ভূতপূর্ব মোগলের* উত্তরাধিকারীকে** ঘোষণা করা হয় ভারতের রাজা। মিরাটে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে উদ্ধারের জন্য যে সব সৈন্য পাঠানো হয় তাদের মধ্যে দেশীয় স্যাপার ও মাইনারদের ছয়টি কোম্পানি ১৫ মে মিরাটে পৌঁছে সেনাপতি মেজর ফ্রেজারকে হত্যা করে অবিলম্বে খোলা মাঠের দিকে যাত্রা করে, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ঘোড়াটানা গোলন্দাজ সৈন্যরা এবং ৬ নং ড্রাগুন গার্ডস্-এর কিছু সৈন্য। বিদ্রোহীদের পঞ্চাশ ষাট জন গুলি বিদ্ধ হয় কিন্তু বাকিরা দিল্লি পালাতে সক্ষম হয়। পঞ্জাবের ফিরোজপুরে ৫৭ নং ৪৫ নং দেশীয় পদাতিক রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে, কিন্তু সশক্তিতে তাদের দমন করা হয়। লাহোর থেকে আসা ব্যক্তিগত চিঠিতে বলা হচ্ছে যে সেখানকার সমস্ত দেশীয় সৈন্যই প্রকাশ্যে বিদ্রোহের অবস্থায়। ১৯ মে কলকাতায় অবস্থিত সিপাহীরা সেন্ট-উইলিয়ম দুর্গ দখলের অসফল চেষ্টা করে। বুশায়ার থেকে বোম্বাইয়ে ফিরে আসা তিন রেজিমেন্ট সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় পাঠানো হয়।

এই সব ঘটনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে মিরাটের ব্রিটিশ কম্যান্ডারের আচরণে অবাক হতে হয় —বিদ্রোহীদের তিনি যে দুর্বলভাবে পশ্চাদ্ধাবন করেন তার চেয়েও কম দুর্বোধ্য রণক্ষেত্রে তাঁর বিলম্বিত উদয়। যমুনার দক্ষিণ তীরে দিল্লি ও বাম তীরে মিরাট, দুই তীরের মধ্যে কেবল দিল্লির কাছে এক ব্রিজ মারফতই যোগাযোগ, তাই পলাতকদের পশ্চাদপসরণ বন্ধ করার মতো এত সহজ কাজ আর কিছু ছিল না।

ইতিমধ্যে মস্ত বিক্ষুব্ধ জেলাতেই সামরিক আইন জারী হয়েছে। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে জমা হচ্ছে যে সৈন্য তা প্রধানত দেশীয়, আশেপাশের রাজন্যরা নাকি ইংরেজ রাজেরই পক্ষ-ঘোষণা করেছে, লর্ড এলগিন ও জেনারেল অ্যাশবার্নহ্যামের সৈন্যদের চিন যাত্রা স্থগিতের জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে সিংহলে, আর পরিশেষে প্রায় পক্ষকালের মধ্যেই ১৪,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানো হবে ইংলন্ড থেকে ভারতে। বর্তমান ঋতুতে ভারতের আবহাওয়া-জনিত বাধা ও পরিবহন ব্যবস্থার একান্ত অভাবে ব্রিটিশ সৈন্যের চলাচল যতই ব্যাহত হোক, দিল্লির বিদ্রোহীরা খুব সম্ভব কোনো দীর্ঘ প্রতিরোধ না দিয়েই ভেঙে পড়বে। তবু, যে ভয়ঙ্করতম ট্রাজেডির অনুষ্ঠান হতে চলেছে, এ হল তার প্রস্তাবনা মাত্র।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ৩০ জুন লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫০৬৫ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

* বিভক্ত করে শাসন করো — সম্পাঃ।
* দ্বিতীয় আকবর — সম্পাঃ।
** দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ভারতে অভ্যুত্থান

লন্ডন, ১৭ জুলাই, ১৮৫৭

দিল্লি বিদ্রোহী সিপাহীদের হস্তগত ও মোগল বাদশাহ* ঘোষিত হবার পর ৮ জুন ঠিক এক মাস হল। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের এই প্রাচীন রাজধানী বিদ্রোহীরা দখলে রাখতে পারবে তেমন কোনো ধারণা অবশ্যই অস্বাভাবিক। দিল্লি সুরক্ষিত কেবল একটি দেয়াল ও একটি সাধারণ পরিখা দিয়ে আর দিল্লির চারিপাশের ও দিল্লিকে শাসনে রাখার মতো টিলা পাহাড়গুলি ইতিমধ্যেই ইংরেজদের দখলে, তারা দেয়াল না ভেঙেই জল সরবরাহ কেটে দেবার মতো সহজ পদ্ধতিতেই স্বল্প সময়ে দিল্লিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারে। তাছাড়া বিদ্রোহী সৈন্যদের যে একটা এলোমেলো দঙ্গল স্বীয় অফিসারদের খুন করে শৃঙ্খলার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ সেনাপত্য অর্পণ করার মতো কাউকে খুঁজে পায়নি, তারা নিশ্চয় এমন একটা দল, যাদের কাছ থেকে গুরুতর ও দীর্ঘায়ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আশা সবচেয়ে কম। বিভ্রান্তি আরো পাকিয়ে তোলার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সির সর্বাঞ্চল থেকে নতুন নতুন বিদ্রোহী বাহিনী এসে অবরুদ্ধ দিল্লি সৈন্যদের সংখ্যা দিন দিন বাড়াচ্ছে, যেন একটা স্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুসারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই মৃত্যুদণ্ডিত নগরে। দেওয়ালের বাইরে ৩০ ও ৩১ মে তারিখের যে দুটি অভিযানের ঝুঁকি নেয় বিদ্রোহীরা এবং গুরুতর ক্ষতিতে যা প্রতিহত হয়, তার উদ্ভব যেন আত্মনির্ভরতা বা শক্তির মনোভাব থেকে নয়, বরং মরীয়াপনা থেকে। একমাত্র অবাক লাঘে শুধু ব্রিটিশের আক্রমণগুলির ধীরতায় — কিছুটা পরিমাণে যদিও তা ব্যাখ্যা করা যায় ঋতুর ভয়াবহতা ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব দিয়ে। সর্বাধিনায়ক জেনারেল অ্যানসন ছাড়াও, ফরাসি পত্রে বলা হয়েছে, মারাত্মক তাপের শিকার হয়েছে প্রায় ৪,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য, সম্মুখভাগের যুদ্ধে দুর্ভোগ সইতে হয়েছে শত্রু সৈন্যের গুলি থেকে ততটা নয়, যতটা রোদ্দুরের জন্য। যানবাহনাদির স্বল্পতায় আম্বালাস্থিত প্রধান ব্রিটিশ সৈন্যদলের দিল্লি চড়াও হতে লাগে প্রায় সাতাশ দিন, অর্থাৎ দিনে পথ হেঁটেছে প্রায় দেড় ঘণ্টা হারে। আম্বালায় ভারি কামান না থাকায় এবং সেই কারণে নিকটতম অস্ত্রাগার যা শতদ্রুর অপর পারে ফিলাউরে অবস্থিত, সেখান থেকে দখলী-কামানবাহিনী নিয়ে আসতে হওয়ায় আরো দেরি হয়।এই সব সত্ত্বেও দিল্লির পতন সংবাদ যে কোনো দিন আশা করা যায়, কিন্তু তারপর? ভারত সাম্রাজ্যের চিরাচরিত কেন্দ্রের ওপর বিদ্রোহীদের অবাধ দখলের এক মাসেই যদি বেঙ্গল আর্মির একেবারে ভেঙে পড়া, কলকাতা থেকে উত্তরে পঞ্জাব ও পশ্চিমে রাজপুতানা পর্যন্ত বিদ্রোহ ও সৈন্যদলত্যাগের ঘটনা ছড়ানো, ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে টলিয়ে দেওয়ার দিক থেকে বোধ করি প্রবলতম উত্তেজিকার কাজ হয়ে থাকে, তাহলে দিল্লির পতনে সিপাহীদের মধ্যে নৈরাশ্য ছড়ালেও তাতেই বিদ্রোহ প্রশমিত, তার প্রসার রুদ্ধ কিংবা ব্রিটিশ শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, এ কথা ভাবা সবচেয়ে বড়ো বুল। ২৮,০০০ রাজপুত, ২৩,০০০ ব্রাহ্মণ, ১৩,০০০ মুসলমান, ৫,০০০ নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বাকিটা ইউরোপীয় দিয়ে গড়া ৮০,০০০ সৈন্যের গোটা দেশীয় বেঙ্গল আর্মি থেকে বিদ্রোহ, দলত্যাগ বা বরখাস্তের দরুন ৩০,০০০ সৈন্যই অদৃশ্য

হয়েছে, আর এ আর্মির বাকিটা থেকে কয়েকটা রেজিমেন্ট খোলাখুলিই ঘোষণা করেছে যে তারা ব্রিটিশ কর্তৃতেবর প্রতি বিশ্বস্ত ও সমর্থক থাকবে শুধু দেশীয় সৈন্যদের যে কাজে লাগানো হচ্ছে সেই কাজটি বাদে, দেশীয় রেজিমেন্টের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে তারা সাহায্য করবে না, বরং সাহায্য করবে তাদের 'ভাইয়া'দের। কলকাতা থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকটা স্টেশনেই তার সত্যকার দৃষ্টান্ত মিলেছে। দেশীয় সিপাহীরা কিছুকাল নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, কিন্তু সেই ধারণা হয় যে তাদের যথেষ্ট শক্তি আছে, অমনি বিদ্রোহ করে বসে। যে সব রেজিমেন্ট এখনো ঘোষণা করেনি এবং যে সব দেশীয় অধিবাসী এখনো বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলায়নি, তাদের 'বিশ্বস্ততা' সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি ৯প্র্ল=ঁ=ঁ ৯ঁপ্রক্ষ-এর (৩০) একজন ভারতস্থ সংবাদদাতা।

তিনি বলেন, সব শান্ত এ কথা পড়লে বুঝবেন যে তার অর্থ দেশীয় সৈন্যরা এখনো প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেনি, অধিবাসীদের অসন্তুষ্ট অংশ এখনো খোলাখুলি বিদ্রোহ করেনি, তারা হয় অতি দুর্বল, অথবা ভাবছে যে তারা দুর্বল, নয়ত অপেক্ষা করছে আরো উপযুক্ত একটা মুহূর্তের জন্য। ঘোড়সওয়ার বা পদাতিক কোনো দেশীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'বিশ্বস্ততার পরিচয়'এর কথা যখন পড়বেন তখন বুঝবেন যে তার অর্থ তথা-প্রশংসিত রেজিমেন্টগুলির শুধু অর্ধেকটাই সত্যিই বিশ্বস্ত, বাকি অর্ধেকটা শুধু অভিনয় করছে যাতে বরং ইউরোপীয়দের অসতর্ক অবস্থায় পায়, নয়ত তাদের ওপর সন্দেহ না থাকায় বিদ্রোহভাবাপন্ন সাথীদের যাতে আরো সহজে সাহায্য করতে পারে।'

পঞ্জাবে প্রকাশ্য বিদ্রোহ নিরোধ করা গেছে শুধু দেশীয় সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়ে। অযোধ্যায় ইংরেজরা কেবল রেসিডেন্সি লক্ষ্নৌ দখলে রাখতে পেরেছে বলা যায়, তাছাড়া সর্বত্রই দেশীয় রেজিমেন্টগুলি বিদ্রোহ করেছে, গুলিগোলা নিয়ে পালিয়েছে, সমস্ত বাংলো পুড়িয়ে ছাই করেছে, এবং যোগ দিয়েছে হাতিয়ার তুলে ধরা অধিবাসীদের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, ইংরেজ আর্মির আসল অবস্থা সবচেয়ে ভালো প্রকাশ পাচ্ছে এই ঘটনায় যে পঞ্জাব ও রাজপুতানা উভয় ক্ষেত্রেই ভ্রাম্যমাণ কোর স্থাপন করা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। তার অর্থ, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলগুলির মধ্যে যোগাযোগ বহাল রাখতে ইংরেজরা তাদের সিপাহী সৈন্য বা দেশীয় অধিবাসীদের ওপর ভরসা করতে পারছে না। উপদ্বীপীয় যুদ্ধ (পেরিনীজ) কালে (৩১) ফরাসিদের মতো তারা শুধু স্বীয় সৈন্যাধিকৃত ভূমিটুকু এবং তদধীন পরিপার্শ্বটুকু শাসনে রাখছে। আর তাদের আর্মির বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য তারা নির্ভর করছে ভ্রাম্যমাণ কোর-এর ওপর — এ দলের কাজ এমনিতে অতি সঙ্গীন, তাতে যত বেশি জায়গা জুড়ে তা ছড়াবে, স্বভাবতই তত কমে যাবে তার প্রবলতা। ব্রিটিশ সৈন্যের বাস্তব অপ্রতুলতা আরো প্রমাণ হয় এই ঘটনায় যে, বিক্ষুব্ধ স্টেশনগুলি থেকে ধনসম্পদ সরাবার জন্য তারা বহনে সিপাহীদেরই লাগাতে বাধ্য হয় — সিপাহীরা বিনা ব্যতিক্রমে যাত্রাপথে বিদ্রোহ করে ও ভার-পাওয়া ধনসম্পদ নিয়ে ফেরার হয়। ইংলন্ড থেকে পাঠানো সৈন্যরা যেহেতু সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও নভেম্বরের আগে পৌঁছবে না এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে ইউরোপীয় সৈন্য টেনে আনা যেহেতু আরো বিপজ্জনক হবে — মাদ্রাজ সিপাহীদের ১০ নং রেজিমেন্ট ইতিমধ্যেই বিক্ষোভের লক্ষণ দেখিয়েছে — তাই বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে নিয়মিত কর সংগ্রহের ধারণা ত্যাগ করতে হবে ও ভাঙনের প্রক্রিয়াকে চলতে দিতেই হবে। যদি ধরে নিই যে বর্মীরা এ উপলক্ষে ফয়দা ওঠাবে না, গোয়ালিয়রের মহারাজা* ইংরেজদের সমর্থন করেই যাবে এবং সর্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় সৈন্য যার হাতে আছে নেপালের সেই অধিপতি** শান্তই থাকবে, বিক্ষুব্ধ পেহোয়ার অশান্ত পার্বত্য উপজাতিদের সঙ্গে যোগ দেবে না এবং পারস্যের শাহ*** হেরাত ছেড়ে যাওয়ার মতো মূর্খতা দেখাবে না, এমন কি তাহলেও গোটা বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ফের জয় করতে হবে এবং গোটা ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ফের গড়তে হবে। এই বৃহৎ ব্যাপারের খরচাটা সবই পড়বে ব্রিটিশ জনগণের ওপর। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় ঋণ মারফত প্রয়োজনীয় অর্থ তুলতে পারবে বলে লর্ড গ্রেনভিল লর্ড সভায় যে ধারণা দিয়েছেন তা কতো পাকা, তার বিচার হবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির বিক্ষুব্ধ অবস্থায় বোম্বাইয়ের টাকার বাজারের প্রতিক্রিয়া থেকে। তৎক্ষণাৎ দেশীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়, ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ

টাকা তুলে নেওয়া হয়, সরকারি সিকিউরিটি বিক্রয়ের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং শুধু বোম্বাইয়ে নয়, তার চারিপাশেও প্রচুর পরিমাণ মজুদের হিড়িক লাগে।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ১৭ জুলাই লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫০৮২ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ৪ আগস্ট প্রকাশিত

* দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ — সম্পাঃ।
* সিন্ধিয়া — সম্পাঃ।
** জঙ্গ বাহাদুর — সম্পাঃ।
*** নাসির উদ-দিন — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ভারত প্রশ্ন

লন্ডন, ২৮ জুলাই, ১৮৫৭

'মৃত কক্ষে' (৩২) গত রাতে মিঃ ডিজরেলি যে তিন ঘন্টা বক্তৃতা দিয়েছেন তা কানে না শুনে পড়লেই বরং লাভ হবে, ক্ষতি হবে না। কিছুকাল যাবৎ মিঃ ডিজরেলি বক্তৃতার একটা উদাত্ত গম্ভীর চাল, উচ্চারণের একটা বিশদ ধীরতা ও আনুষ্ঠানিকতার একটা নিরাবেগ পদ্ধতি গ্রহণ করছেন, তা একজন প্রত্যাশিত মন্ত্রীর মর্যাদা-শোভনতা সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত ধারণার সঙ্গে যতই মিলুক, পীড়িত শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে সত্যই কষ্টকর। একদা তিনি মামুলী কথাতেও এপিগ্রামের তীক্ষ্ণ ঝলক দিতে পারতেন। এখন এপিগ্রামকেও শালীনতার প্রথাসিদ্ধ বিবর্ণতায় সমাধিস্থ করতে তিনি চেষ্টিত। মিঃ ডিজরেলির মতো যে বক্তা খড়্গ তোলার চাইতে ছোড়া চালাতেই বেশি ওস্তাদ, তাঁর পক্ষে ভল্টেয়ার-এর এই হুঁশিয়ারি (Tous les genres sont bons excepte le genre ennuyeux)* ভোলা অতি অনুচিত।

মিঃ ডিজরেলির বর্তমান বাগ্মিতার চারিত্র্য সূচক এই টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া তিনি পামারস্টোনের ক্ষমতারোহণের পর হতে তাঁর পার্লামেন্টী অনুষ্ঠান থেকে বাস্তবতার সম্ভবপর প্রতিটি আকর্ষণকেই ছেঁটে দেবার রীতিমতো চেষ্টা করেছেন। প্রস্তাব পাশের জন্য তাঁর বক্তৃতা নয়, বরং তাঁর বক্তৃতার আয়োজনের জন্যই প্রস্তাব। এগুলিকে বলা চলে স্ব-নাকচী প্রস্তাব, কারণ তারা এমন ভাবে রচিত যে পাশ হলেও শত্রুর অনিষ্ট করবে না, হেরে গেলেও প্রস্তাবকের ক্ষতি হবে না। বস্তুত তাদের উদ্দেশ্য পাশ হওয়া বা হেরে যাওয়া নয়, নিতান্তই ভুলে যাওয়া। তারা এসিডও নয় অ্যালকালিও নয়, জাত-নিরপেক্ষ। বক্তৃতাটা কর্মের বাহন নয়, কর্মের শঠতা থেকেই বক্তৃতার অবকাশলাভ। পার্লাবেন্টী বাগ্মিতার ক্লাসিকাল ও চূড়ান্ত রূপ বস্তুত বা এই, কিন্তু তাহলে অন্ততপক্ষে, পার্লামেন্টী বাগ্মিতার এই চূড়ান্ত রূপের পক্ষে পার্লামেন্টীপনার সমস্ত চূড়ান্ত রূপেরই যে ভাগ্য — জঞ্জাল নামে অভিহিত হবার সেই সাধারণ ভাগ্যে আপত্তি করা উচিত নয়। অ্যারিস্টটল বলেছেন ক্রিয়া হল নাটকের প্রধান সূত্র*। রাজনৈতিক বক্তৃতাতেও তাই। ভারত বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মিঃ ডিজরেলির বক্তৃতা প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রচারণী সমিতির বিবরণীতে প্রকাশ হতে পারত, দেওয়া যেতে পারত মেকানিক বিদ্যালয়ের সভায়, অথবা বার্লিন আকাদমিতে তা পেশ করা যেতে পারত প্রতিযোগিতার প্রবন্ধ হিসাবে। কোনো স্থানে, কখন, কী ব্যাপারে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে, স্থান কাল উপলক্ষ্যের প্রতি তাঁর বক্তৃতার এই অদ্ভুত নিরপেক্ষতাই সবচেয়ে বেশি প্রমাণ করে যে, তা স্থান কাল উপলক্ষ্য কিছুরই যোগ্য নয়। রোম সাম্রাজ্যের পতন বিষয়ে যে পরিচ্ছেদ মঁতেস্ক্য বা গিবনের বইয়ে (৩৩) চমৎকার পড়া যায়, তা এক প্রচণ্ড ভুল হবে যদি তা বসানো হয় এক রোমান সিনেটারের মুখে, যার কাজই ছিল সে পতন রোধ করা। এ কথা সত্যি যে আমাদের আধুনিক

পার্লামেন্টে মর্যাদা বা আকর্ষণ কিছুরই অভাব না ঘটিয়ে এমন এক স্বাধীন বক্তার ভূমিকা কল্পনা করা যায়, যিনি ঘটনার বাস্তব ধারাকে প্রভাবিত করতে হতাশ হয়ে শ্লেষাত্মক নিরপেক্ষতার একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুষ্ট থাকছেন। তেমন একটা ভূমিকা মোটের ওপর সফলভাবে অভিনয় করেছিলেন লুই ফিলিপের প্রতিনিধি সভার বিগত মিঃ গার্নিয়ে-পাজেস, অস্থায়ী সরকারের গার্নিয়ে-পাজেস নয়, কিন্তু অপ্রচলিত এক উপদলের (৩৪) স্বীকৃত নেতা মিঃ ডিজরেলি এ ধারার সাফল্যকেও চরম পরাজয় বলে গণ্য করবেন। ভারতীয় আর্মির বিদ্রোহে নিশ্চয়ই বাগ্মিতা প্রদর্শনের একটা চমৎকার সুযোগ ছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনায় তাঁর বিরস রীতির কথা ছেড়ে দিলেও, যা উপলক্ষ করে বক্তৃতা তাঁর সেই প্রস্তাবের সার কথাটা কী? এটা কোনো প্রস্তাবই নয়। তিনি দুটি সরকারি দলিলের সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্বেগ দেখান, তার একটি যে সত্যই বর্তমান সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ নিশ্চিত নন, এবং অন্যটি সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত যে তা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে আশু সম্পর্কিত নয়। সুতরাং তাঁর প্রস্তাব ও তাঁর বক্তৃতার মধ্যে শুধ এতটুকু ছাড়া আর কোনো যোগাযোগ ছিল না যে, প্রস্তাবটা লক্ষ্যহীন একটা বক্তৃতার আগমনী এবং লক্ষ্যটা স্বীকারোক্তি দিল যে তা নিয়ে বক্তৃতা চলে না। তথাপি, ইংলন্ডের অতি বিখ্যাত অ-পদস্থ রাষ্ট্র-নায়কের অতি বিস্তারিত মতামত হিসাবে মিঃ ডিজরেলির বক্তৃতায় বিদেশের মনোযোগ আকর্ষণীয়। আমি শুধু তাঁর ipsissima verba-তেই* 'ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের পতন বিষয়ে ভাবনার' একটা ছোটো বিশ্লেষণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

'ভারতে অশান্তি কি সামরিক হাঙ্গামা নাকি তা জাতীয় বিদ্রোহ? সৈন্যদের আচরণ কি একটা আকস্মিক আবেগের ফল, নাকি তা একটা সংগঠিত চক্রান্তের পরিণতি?'

এই কথার ওপরেই গোটা সমস্যাটা দাঁড়িয়ে আছে বলে মিঃ ডিজরেলি জোর দেন। তিনি সমর্থন করে বলেন যে গত দশ বছরের আগে পর্যন্ত ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে divide et impera এই প্রাচনী নীতির ওপর — কিন্তু সে নীতি চালু করা হয় ভারতস্থ বিভিন্ন জাতিসত্তাকে সম্মান করে, তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ পরিহার করে এবং তাদের ভূসম্পত্তি রক্ষা করে। দেশের উদ্দাম প্রেরণাকে ধারণ করার সেফটি-বালব হিসাবে কাজ করেছে সিপাহী আর্মি। কিন্তু ইদানীং কালে ভারত সরকারে গৃহীত হয়েছে একটি নতুন নীতি — জাতিসত্তা নাশের নীতি। এ নীতি কাজে পরিণত করা হয়েছে বলপ্রয়োগে দেশীয় রাজাদের ধ্বংস করে, মালিকানা ব্যবস্থার নড়চড় করে এবং জনগণের ধর্মে হাত দিয়ে। ১৮৪৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এমন সীমায় পৌঁছয় যে যে-করেই হোক রাজস্ব বাড়ানো প্রয়োজন হয়। তখন কাউন্সিলের (৩৫) একটি মিনিট প্রকাশিত হয়, তাতে প্রায় অনাবৃতভাবে এই নীতিটি বিধৃত হয় যে, বর্ধিত রাজস্ব পাবার একমাত্র পন্থা হল দেশীয় রাজাদের ঘাড় ভেঙে ব্রিটিশ এলাকা বাড়ানো। সেই অনুসারে সাতারার রাজার* মৃত্যুর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার পোষ্যপুত্রকে স্বীকার না করে সাতারা রাজ্যকে স্বীয় এলাকাভুক্ত করে। সেই সময় থেকে, স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না রেখে কোনো দেশীয় রাজার মৃত্যু হলেই রাজ্যগ্রাসের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় সমাজের ভিত্তি — পোষ্য গ্রহণের প্রথাকে সরকার নিয়মিতভাবে নাকচ করতে থাকে। এইভাবে ১৮৪৮-৫৪ সালের মধ্যে জোর করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এক ডজনেরও বেশি স্বাধীন রাজন্যের রাজ্য। ১৮৫৪ সালে ৮০,০০০ বর্গ মাইল এলাকার ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ অধিবাসী ও প্রভূত সম্পদের বেরার রাজ্য জোর করে দখল করা হয়। বলপূর্বক রাজ্যগ্রাসের তালিকা মিঃ ডিজরেলি শেষ করেন অযোধ্যার কথা বলে, এতে পূর্ব ভাতরীয় সরকার শুধু হিন্দুদের সঙ্গে নয়, মুসলমানদের সঙ্গেও সংঘাতে আসে। মিঃ ডিজরেলি তারপর দেখান কী ভাবে গত দশ বছরে নতুন প্রথার শাসনে ভারতের মালিকানা বন্দোবস্ত বিঘ্নিত হয়েছে।

তিনি বলেন, 'পোষ্য গ্রহণের নীতিটা শুধু ভারতের রাজা রাজড়াদের বিশেষ অধিকার নয়, হিন্দুস্তানের যারই ভূসম্পত্তি আছে ও যেই হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী তেমন প্রতিটি লোকের ওপরেই তা প্রযোজ্য।'

একটা অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করি :

'বড়ো বড়ো সামন্ত বা জায়গীরদার যারা সামন্ত প্রভুর জন্য রাজসেবা মারফত জমি ভোগ করে অথবা ইনামদার যারা কোনো রকম ভূমিকর না দিয়ে জমি ভোগ করে এবং যারা নিখুঁতভাবে না হলেও অন্তত চলতি

কথায় আমাদের নিষ্কর-ভোগীদের (freeholder) সঙ্গে তুলনীয় — এই দুই শ্রেণির লোকেরাই — ভারতে তাদের সংখ্যা অগণ্য — সর্বদাই স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকলে এই নীতি মারফত মহালের উত্তরাধিকারী পায়। সাতারা-গ্রাস এই শ্রেণির সকলেরই গায়ে লগে, যে দশটি ছোটো কিন্তু স্বাধীন রাজার কথা আগেই বলেছি তাদের রাজ্যগ্রাসে এদের গায়ে লাগে এবং গায়ে লাগার চেয়েও বেশি — চরম আতঙ্ক হয় তাদের, যখন বেরার রাজ্য গ্রাস করা হল। কোন লোকটা নিরাপদ? যাদের আপন ঔরসের সন্তান নেই, সারা ভারতের এমন কোন সামন্ত, কোন নিষ্কর-ভোগীটা নিরাপদ? (শুনুন, শুনুন।) অলস আতঙ্ক তা নয়, ব্যাপকভাবে এ নীতি অনুসরণ ও কার্যকরী করা হয়। ভারতে সেই প্রথম শুরু হল জায়গীর ও ইনাম বাজেয়াপ্তি। এমন অবিচক্ষণ মুহূর্ত অবশ্য আগেও এসেছে যখন পাট্টা যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু পোষ্য গ্রহণের আইন বাতিল করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, সুতরাং যে জায়গীরদার ও ইনামদারের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী নেই তার জায়গীর বা ইনাম বাজেয়াপ্ত করতে কোনো কর্তৃত্ব, কোনো সরকার পারেনি। এ হল রাজস্বের একটা নতুন উৎস, কিন্তু এই সব ব্যাপারে যখন হিন্দুদের ওই শ্রেণিগুলির মন চঞ্চল, তখন সরকার মালিকানা বন্দোবস্ত নড়চড় করার আর একটা পদক্ষেপ নেয় — সভার মনোযোগ আমি এবার সেদিকে আকর্ষণ করতে চাই। ১৮৫৩ সালে কমিটির কাছে পেশ করা সাক্ষ্যের বিবরণ থেকে সভা নিশ্চয় জানেন যে ভারতের বহু জমি নিষ্কর। ভারতে ভূমিকর থেকে মুক্তি এ-দেশের ভূমিকর থেকে অব্যাহতির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সাধারণভাবে ও সহজ করে বললে, ভারতে ভূমিকরই হল রাষ্ট্রের সমগ্র কর।

'এই সব দান পাট্টার উৎস খুঁজে বার করা কঠিন, কিন্তু নিঃসন্দেহেই তা অতি প্রাচীন। নানা ধরনের এগুলি। ব্যক্তিগত নিষ্কর জমি যা বেশ ব্যাপক, তা ছাড়াও মন্দির মসজিদে দান করা বড়ো বড়ো জমি আছে যা ভূমিকর থেকে মুক্ত।'

করমুক্তির মিথ্যে দাবির অজুহাতে ব্রিটিশ বড়োলাট* ভারতীয় ভূসম্পত্তিগুলির পাট্টা পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা নেন। ১৮৪৮ সালে প্রবর্তিত এই নতুন ব্যবস্থায়,

'পাট্টা তদন্তের এ পরিকল্পনা একটা শক্তিশালী সরকার, তেজি একজিকিউটিভ ও সরকারি রাজস্বের অতি ফলন্ত উৎস বলে তৎক্ষণাৎ গৃহীত হয়। সুতরাং বাংলা প্রেসিডেন্সি ও আশেপাশের অঞ্চলে ভূসম্পত্তির পাট্টা তদন্তের জন্য কমিশন জারি হল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও তা জারি হয় এবং হুকুম হল নবপ্রতিষ্ঠিত প্রদেশগুলিতে জরিপ করার, যাতে জরিপ শেষ হবার পর এই সব কমিশনের কাজ চলে যথাযোগ্য দক্ষতায়। কোনোই সন্দেহ নেই যে গত নয় বছর ধরে ভারতের ভূসম্পত্তির নিষ্কর মালিকানার তদন্তকারী এই কমিশনগুলোর কাজ চলেছে বিপল গতিতে এবং প্রভূত ফল পাওয়া গেছে।'

মিঃ ডিজরেলির হিসাবে, স্বত্বাধিকারীরেদ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বছরে ৫ লক্ষ পাউন্ড, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার পাউন্ড, পঞ্জাবে ২ লক্ষ পাউন্ডের কম নয় ইত্যাদি। দেশীয়দের সম্পত্তি দখলের এই একটা পদ্ধতিতে তুষ্ট না থেকে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় অভিজাতদের ভাতা বন্ধ করে দেয়, চুক্তি অনুসারে এ ভাতা দিতে তারা বাধ্য।

মিঃ ডিজরেলি বলেন, 'এ হল নতুন এক উপায়ে বাজেয়াপ্তি, কিন্তু অতি ব্যাপক, চাঞ্চল্যকর ও স্তম্ভিত করার মতো আয়তনে।'

মিঃ ডিজরেলি তারপর দেশীয়দের ধর্মে হাত দেওয়ার কথা বলেন — এ পয়েন্ট নিয়ে আমাদের আলোচনা না করলেও চলে। তাঁর এই সব প্রতিপাদন থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বর্তমান ভারতীয় অশান্তিটা সামরিক হাঙ্গামা নয়, জাতীয় বিদ্রোহ, সিপাহীরা যার ক্রিয়মান হাতিয়ার মাত্র। বর্তমানের আক্রমণাত্মক ধারা অনুসরণ না করে ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের দিকে সরকারকে দৃষ্টি দেবার পরামর্শ দিয়ে তিনি ভাষণ শেষ করেন।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ২৮ জুলাই লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫০৯১ নং সংখ্যায়

১৮৫৭ সালের ১৪ আগস্ট প্রকাশিত

* অ্যারিস্টটল — ‘পোয়েটিকস্’, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ — সম্পাঃ।
* নিজস্ব উক্তিতে — সম্পাঃ।
* আপ্পা সাহেব — সম্পাঃ।
* ডালহৌসি — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ভারত থেকে ডিসপ্যাচ (৩৬)

লন্ডন, ৩১ জুলাই, ১৮৫৭

১৭ জুন পর্যন্ত দিল্লির সংবাদ এবং ১ জুলাই পর্যন্ত বোম্বাইয়ের সংবাদ নিয়ে যে সর্বশেষ ভারতীয় ডাক এসে পৌঁছেছে তাতে অতি অশুভ আশঙ্কাগুলি সত্য হয়ে উঠেছে। যখন বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি (৩৭) মিঃ ভের্নন স্মিথ কমন্স সভায় প্রথম ভারতীয় বিদ্রোহের খবর পেশ করেন, তখন তিনি সপ্রত্যয়ে বলেছিলেন, পরের ডাকেই সংবাদ আসবে যে দিল্লি ধূলিসাৎ হয়েছে। ডাক এল, কিন্তু ‘ইতিহাসের পাতা থেকে’ দিল্লি তখনো ‘নিশ্চিহ্ন’ হয়নি। তখন বলা হল যে, গোলন্দাজ ব্যাটারি ট্রেন ৯ জুনের আগে এসে পৌঁছতে পারছে না, তাই মৃত্যুদণ্ডিত নগরটির ওপর আক্রমণ ওই তারিখ পর্যন্ত পিছতে হবে। ৯ জুনও কেটে গেল কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই। ১২ ও ১৫ জুন কিছু ঘটনা ঘটে, কিন্তু সেটা বরং উল্টোদিকে, ইংরেজরা দিল্লির ওপর চড়াও হল না, বরং ইংরেজদের ওপরেই আক্রমণ করল অভ্যুত্থানীরা, যদিও তাদের বারম্বার আক্রমণগুলো প্রতিহত হয়। দিল্লির পতন তাই ফের মুলতুবী রইল, তার তথাকথিত কারণ এবার আর দখলি-কামানের অভাবমাত্র নয়, বলবৃদ্ধির জন্য জেনারেল বার্নার্ডের অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত, কারণ তাঁর প্রায় তিন হাজারী সৈন্যবাহিনী ৩০,০০০ সিপাহী দ্বারা সুরক্ষিত এবং সবরকম সামরিক রসদে সমৃদ্ধ প্রাচীন রাজধানীটি দখলের পক্ষে একান্তই অপ্রতুল। আজমীর গেটের বাইরে এমন কি একটা ছাউনিও ফেলেছে বিদ্রোহীরা। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত সামরিক লেখকেরা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ৩০ কি ৪০ হাজার লোকের একটা সিপাহী সৈন্যবাহিনীকে দলিত করতে ৩ হাজার লোকের একটা ইংরেজ বাহিনীই যথেষ্ট, ঘটনা যদি তা না হয় তাহলে লন্ডন টাইমস-এর ভাষায়, ভারত ‘পুনর্বিজয়ে’ ইংলন্ড কী করে সমর্থ হবে’?

ভারতে ব্রিটিশ আর্মি আসলে হল মোট ৩০,০০০ লোক নিয়ে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে ইংলন্ড থেকে সর্বোচ্চ যে সংখ্যাটা তারা পাঠাতে পারে, তা ২০,০০০ কি ২৫,০০০-এর বেশি হবে না, তার মধ্যে ৬,০০০ যাবে ভারতে ইউরোপীয় সৈন্যদের শূন্য পদ পূরণে, বাকি ১৮,০০০ কি ১৯,০০০ লোকের সংখ্যা যাত্রাজনিত ক্ষয়ক্ষতি, আবহাওয়াজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় কমে গিয়ে দাঁড়াবে ১৪,০০০ সৈন্যের মতো, যা রণাঙ্গনে পৌঁছতে পারবে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে হয় অতি অসমান অনুপাতে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নয় আদৌ সম্মুখীন হওয়া বাদ দিতে হবে। তবুও দিল্লির চারপাশে সৈন্য জমায়েতে তাদের ধীরতার কারণ এখনো আমাদের বোধগম্য নয়। স্যার চার্লস নেপিয়ারের সময় যেটা প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি সেই গরম যদি বছরের এই সময়টায় একটা দুর্জয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে কয়েক মাস পরে, ইউরোপীয় সৈন্যরা যখন এসে পৌঁছবে তখন চুপ করে থাকার আরো নিশ্চিত একটা অজুহাত পাওয়া যাবে বর্ষা থেকে। এ কথা কখনো ভোলা উচিত নয় যে, বর্তমান বিদ্রোহ আসলে শুরু হয় জানুয়ারি মাসে, তাই বারুদ মজুত ও সৈন্য তৈরি রাখার যথেষ্ট হুঁশিয়ারি ব্রিটিশ সরকার পেয়েছিল।

অবরোধকারী ব্রিটিশ সৈন্যদের মুখে সিপাহীরা দীর্ঘদিন দিল্লি অধিকার করে থাকার স্বাভাবিক ফল অবশ্যই দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহ ছড়ায় একেবারে কলকাতার ফটক পর্যন্ত, পঞ্চাশটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট অদৃশ্য হয়, খোদ বেঙ্গল আর্মিটা হয়ে দাঁড়ায় অতীতের এক কল্পকথা, এবং বিস্তীর্ণ এলাকা ধরে ছড়িয়ে থাকা ও

যোগাযোগহীন এক একটা জায়গায় আটকে পড়া ইউরোপীয়রা হয়ত বিদ্রোহীদের হাতে জবাই হয়, নয়ত একটা মরীয়া আত্মরক্ষার পথ নিতে হয় তাদের। খাস কলকাতাতেই, সরকারি শাসনপীঠকে সচকিত করার মতো খুঁটিনাটিতে অতি সম্পূর্ণ বলে কথিত একটা চক্রান্ত উদ্‌ঘাটিত ও সেখানে বহাল দেশীয় সৈন্য দলগুলিকে ভেঙে দেবার পর সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীরা একটি স্বেচ্ছা রক্ষী বাহিনী গড়েছে। বারাণসিতে একটি দেশীয় রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার প্রচেষ্টায় বাধা দেয় একদল শিখ ও ১৩ নং অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার বাহিনী। এ ঘটনাটা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের মতো শিখরাও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমস্বার্থে মিলছে এবং এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমস্ত জাতির সাধারণ ঐক্য সত্বর প্রসারিত হচ্ছে। ইংরেজদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ভারতে তাদের পুরো শক্তিটাই হল সিপাহী সৈন্যবাহিনী। এবার হঠাৎ তারা রীতিমতোই বুঝে ফেলেছে যে, এই সৈন্যবাহিনীটাই তাদের পরম বিপদ। বিগত ভারতীয় বিতর্কের সময় বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি মিঃ ভের্নন স্মিথ তখনো ঘোষণা করেছিলেন যে, ‘দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে বিদ্রোহের কোনো সম্পর্ক নেই এ কথা খুব জোর করে বলা যায় না।’ দুই দিন পরে ওই একই ভের্নন স্মিথকে একটি ডিসপ্যাচ প্রকাশ করতে হয়, তাতে ছিল এই অশুভ অনুচ্ছেদটি :

‘আটক কাগজপত্র থেকে ষড়যন্ত্রে জড়িত সন্দেহে অযোধ্যার ভূতপূর্ব রাজাকে* ১৪ জুন ফোর্ট উইলিয়মে চালান করা হয় ও তাঁর অনুচরদের নিরস্ত্র করা হয়।’

ক্রমশ অন্যান্য ঘটনাও ফাঁস হবে যাতে এমন কি জন বুলেরও এ প্রত্যয় জন্মাবে যে, সে যেটাকে সামরিক মিউটিনি বলে ভাবছে সেটা আসলে একটা জাতীয় বিদ্রোহ।

ইংরেজ সংবাদপত্র এই বিশ্বাসে ভারি একটা সন্তোষলাভের ভান করছে যে, বিদ্রোহ এখনো বাংলা প্রেসিডেন্সির সীমা ছাড়ায়নি এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ আর্মির বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নাকি বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অবস্থার এই প্রীতিকর ধারণাটা কিন্তু গত ডাকে পাওয়া ঔরঙ্গাবাদে নিজামের** ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বিদ্রোহের ঘটনার সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না। ঔরঙ্গাবাদ হল বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ঔরঙ্গাবাদ জেলার সদর, তাই সত্য কথাটা এই যে, গত ডাকে বোম্বাই আর্মিতে বিদ্রোহ শুরুর সংবাদই এসেছে। ঔরাঙ্গাবাদ বিদ্রোহ অবশ্য জেনারেল উডবার্ন সঙ্গে সঙ্গেই দমন করেছেন বলে কথিত। কিন্তু মিরাট বিদ্রোহও কি সঙ্গে সঙ্গেই দমিত বলে কথিত হয়নি? স্যার এইচ. লরেন্স লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহ শান্ত করার পর তা কি ফের পক্ষকাল পরে আরো দুর্জয় হয়ে আবির্ভূত হয়নি? মনে পড়বে নাকি যে, ভারতীয় আর্মিতে বিদ্রোহের প্রথম সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল পুনস্থাপিত শৃঙ্খলার খবর? বোম্বাই ও মাদ্রাজ আর্মির অধিকাংশই যদিও নিচু জাতের লোক দিয়ে গঠিত, তাহলেও তাদের প্রতি রেজিমেন্টেই শখানেক করে রাজপুত মেশানো আছে, বেঙ্গল আর্মির উচ্চবর্ণের বিদ্রোহীদের সঙ্গে আকর্ষক সংযোগ স্থাপনের পক্ষে সংখ্যাটা খুবই যথেষ্ট। পঞ্জাব শান্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, ‘ফিরোজপুরে ১৩ জুন সামরিক প্রাণদণ্ডের ঘটনা ঘটেছে’, আর ভোনের সৈন্যদল — ৫ নং পঞ্জাব পদাতিককে প্রশংসা করা হচ্ছে ‘৫৫ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর চমৎকার পশ্চাদ্ধাবন করেছে বলে।’ মানতেই হবে যে, এটা ভারি একটা আশ্চর্য রকমের ‘শান্তি’।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ৩১ জুলাই লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫০৯১ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ১৪ আগস্ট প্রকাশিত

* ওয়াজি আলি শাহ — সম্পাঃ।
** হায়দরাবাদ রাজ্যের অধিপতি — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ভারতীয় অভ্যুত্থানের অবস্থা

লন্ডন, ৪ আগস্ট, ১৮৫৭

বিগত ভারতীয় ডাকে বিপুলায়তন রিপোর্ট লন্ডনে এসে পৌঁছেছে, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফে তার নিতান্ত আভাসটুকু পাওয়া গিয়েছিল, তারপর থেকে দিল্লি দখলের গুজব দ্রুত ছড়ায় এবং এতই সঙ্গতি লাভ করে যে, স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনও প্রভাবিত হয়। স্বল্পাকারে সেভাস্তপল দখলের ধাপ্পাটারই (৩৮) একটা দ্বিতীয় সংস্করণ তা। এই শুভ সংবাদটি যেখান থেকে সংগৃহীত বলে কথিত সেই মাদ্রাজ দলিলগুলোর তারিখ ও বিষয়বস্তুর বিন্দুমাত্র যাচাই করলেই ভ্রান্তি নিরসন হত। বলা হচ্ছে মাদ্রাজ সংবাদের ভিত্তি আগ্রা থেকে ১৭ জুন তারিখের লেখা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, কিন্তু ১৭ জুনে লাহোর থেকে প্রচারিত একটা সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ১৬ তারিখের বিকাল চারটা পর্যন্ত দিল্লির সমুখে সবকিছুই চুপচাপ ছিল, আর ১ জুলাই তারিখের The Bombay Times (৩৯) বলছে যে, 'কতকগুলি হামলা প্রতিহল করার পর ১৭ তারিখ সকালে জেনারেল বার্নার্ড সৈন্যবৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।' মাদ্রাজ সংবাদের তারিখ নিয়ে এই পর্যন্ত। আর তার বিষয়বস্তু — সেটা স্পষ্টতই সবলে দিল্লির টিলা দখল বিষয়ে জেনারেল বার্নার্ডের ৮ জুন তারিখের বুলেটিন এবং ১২ ও ১৪ জুন অবরুদ্ধদের হামলা সম্পর্কে কয়েকটি ব্যক্তিগত রিপোর্ট থেকে গড়া।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপ্রকাশিত পরিকল্পনাগুলি থেকে ক্যাপ্টেন লরেন্স অবশেষে দিল্লি ও তার সৈন্যাবাসগুলির একটা সামরিক ছক রচনা করেছেন। এ থেকে দেখি যে, প্রথমে যা বলা হয়েছিল দিল্লি ঠিক অতটা দুর্বলভাবে এবং এখন যা ভান করা হয়েছে ঠিক অতটা জোরালভাবে সুরক্ষিত নয়। এখানে একটা কেল্লা আছে, যা চড়াও হয়ে অথবা নিয়মিত অবরোধ দ্বারা দখল করা সম্ভব। দেওয়ালগুলো লম্বায় সাত মাইলের বেশি এবং নিরেট পাথরের পাকা গাঁথনি, কিন্তু খুব বেশি উঁচু নয়। পরিখাটা সরু এবং অতি গভীর নয় আর পার্শ্বভাগের গঠন থেকে সংযোজন দেওয়াল রক্ষার মতো অগ্নিবর্ষণ পুরোপুরি চলে না। কিছুটা পর পর মার্তেল্লো মিনার আছে। আকারে এগুলি অর্ধবৃত্তাকার ও বন্দুক চালাবার জন্য ছিদ্র করা। দেওয়ালের ওপর থেকে মিনারের মধ্য দিয়ে ঘুর-সিঁড়িতে পরিখার সমতলস্থ প্রকোষ্ঠে নেমে আসা যায়, পদাতিক দলের অগ্নিবর্ষণের জন্য এগুলিও ছিদ্র করা, পরিখা পেরিয়ে প্রাচীর উল্লম্ফনের জন্য প্রেরিত দলগুলির পক্ষে তা ভারি বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। সংযোজনী দেওয়াল রক্ষার জন্য যে গড়গুলো আছে তাতেও রাইফেলধারীদের জন্য ব্যাঙ্কয়েট আছে, কিন্তু গোলা দেগে তা দাবিয়ে রাখা যায়। অভ্যুত্থান যখন শুরু হয় তখন নগরের অভ্যন্তরস্থ অস্ত্রাগারে ছিল ৯,০০,০০০ কার্তুজ, দুটি পরিপূর্ণ দখলি-কামান সরঞ্জাম, বহুসংখ্যক লড়ুয়ে কামান এবং ১০,০০০ মাস্কেট। অধিবাসীদের ইচ্ছাক্রমে বারুদের গুদাম বহু আগেই শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লির বাইরে সৈন্যাবাসগুলিতে এবং অন্তত ১০,০০০ পিপে বারুদ আছে তাতে। ৮ জুন জেনারেল বার্নার্ড যে কম্যান্ডিং টিলাগুলো দখল করেন সেগুলো দিল্লির উত্তর-পশ্চিম দিকে, নগর প্রাচীরের বাইরের সৈন্যাবাসগুলিও ছিল সেখানে।

প্রামাণিক পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করা এই বিবরণ থেকে বোঝা যাবে একটা coup de main-[a*] বিদ্রোহের এ ঘাঁটি ভেঙে পড়ত যদি বর্তমানে দিল্লির সামনে যে ব্রিটিশ সৈন্য জড়ো হয়েছে তারা ২৬ মে তারিখেই সেখানে পৌঁছতে পারত, এবং তারা পৌঁছতে পারত যদি যথেষ্ট যানবাহন থাকত তাদের। The Bombay Times-এ প্রকাশিত ও লন্ডনের কাগজগুলিতে পুনঃপুনঃ প্রকাশিত জুনের শেষ পর্যন্ত যে রেজিমেন্টগুলি বিদ্রোহ করেছে তাদের তালিকা এবং কোন তারিখে তারা বিদ্রোহ করে তা পর্যালোচনা করলে নিসংশয়ে প্রমাণ হবে যে, ২৬ মে তারিখে দিল্লি দখল করেছিল মাত্র ৪,০০০ কি ৫,০০০ বিদ্রোহী, সাত মাইল লম্বা একটা দেওয়াল রক্ষার কথা এ বাহিনী মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারত না। মিরাট ছিল দিল্লি থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে এবং ১৮৫৩ সালের শুরু থেকে তা সর্বদাই বেঙ্গল আর্টিলারির সদর দপ্তর হয়ে থেকেছে, এই মিরাটেই ছিল সামরিক-বৈজ্ঞানিক কাজের প্রধান গবেষণাগার এবং লড়ুয়ে কামান ও দখলি-কামান

চালনার চাঁদমারি, তাই আরো দুর্বোধ্য ঠেকে যে ব্রিটিশ সৈন্যরা যে ধরনের coups de main দিয়ে সর্বদাই দেশীয়দের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছে তা চালানোর মতো প্রয়োজনীয় উপায়ের অভাব ঘটবে ব্রিটিশ সেনাপতির। প্রথমে শুনলাম যে দখলি-কামান বাহিনীর* অপেক্ষা করা হচ্ছে, পরে শোনা গেল যে সৈন্যবৃদ্ধি প্রয়োজন, আর এখন লন্ডন কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম ওয়াকিবহাল পত্রিকা ৯প্র উত্রপ্রক্ষ্মক্ষ (৪০) আমাদের জানাচ্ছে :

'আমাদের সরকার একথা সত্য বলে জানে যে, জেনারেল বার্নার্ডের রসদ ও গুলিগোলার ঘাটতি আছে, গুলিগোলা যেটুকু আছে তাতে সৈন্য পিছু বড়ো জোর ২৪ রাউন্ড করে হবে।'

দিল্লির টিলাগুলো দখল করা সম্পর্কে ৮ জুন তারিখের জেনারেল বার্নার্ডের নিজস্ব বুলেটিন থেকে দেখি যে, তিনি পরের দিনই দিল্লি আক্রমণ করবেন বলে প্রথমে স্থির করেছিলেন। এ পরিকল্পনা পূরণ না করে একটা না একটা আকস্মিক ঘটনায় তিনি অবরুদ্ধদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাতেই সীমাবদ্ধ।

এই মুহূর্তে উভয় পক্ষের সৈন্যবলের হিসাব করা অতি কঠিন। ভারতীয় সংবাদপত্রের বিবৃতিগুলি একান্তই পরস্পরবিরোধী, কিন্তু বোনাপার্ট-পন্থী Pays (৪১) পত্রিকার একটা ভারতীয় সংবাদের ওপর কিছুটা ভরসা করা যায় বলে আমাদের ধারণা, মনে হয় এটির উৎস কলকাতার ফরাসি কনসাল থেকে। তাঁর মতে ১৪ জুন জেনারেল বার্নার্ডের ছিল প্রায় ৫,৭০০ সৈন্য। ওই মাসের ২০ তারিখে প্রত্যাশিত সৈন্যাগমে তা দ্বিগুণ হবে (?) বলে আশা করা হচ্ছিল। তাঁর গোলন্দাজ বাহিনীতে আছে ৩০টি ভারি দখলি-কামান অথচ অভ্যুত্থানীদের সৈন্যবল ধরা হচ্ছে ৪০,০০০ লোক, তাদের সংগঠন খুব খারাপ, কিন্তু আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার সর্ববিধ উপায় তাদের হাতে প্রচুর আছে।

En passant * বলি যে, আজমীর গেটের বাইরে সম্ভবত গাজী খাঁর কবরখানায় যে ৩,০০০ অভ্যুত্থানী ছাউনি ফেলেছে তারা কিছু কিছু লন্ডন কাগজ যা ভাবছে সে ভাবে ইংরেজ ফৌজের সম্মুখীন নয়, বরং দিল্লির গোটা প্রস্থ তাদের মাঝখানে, কেননা আজমীর গেট হল আধুনিক দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের এক প্রান্তে, প্রাচীন দিল্লির ধ্বংসাবশেষের উত্তরে। শহরের এ দিকটায় এমন কিছু নেই যাতে এ রকম আরো কয়েকটা ছাউনি ফেলা অভ্যুত্থানীদের বন্ধ হয়। শহরের উত্তর-পূর্ব বা নদীর দিকে তারা ভাসমান সেতু দখলে রেখেছে, দেশবাসীর সঙ্গে তাদের অবিরত যোগাযোগ বজায় আছে, সৈন্য ও রসদের অব্যাহত জোগান পেতে পারে তারা। ক্ষুদ্রতর আকারে দিল্লি হল এক দুর্গ, স্বদেশের সমস্ত অভ্যন্তরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ যার খোলা (সেভাস্তপল-এর মতো)।

ব্রিটিশ আক্রমণের বিলম্বে অবুদ্ধরা প্রতিরক্ষার জন্য একটা বৃহৎ সংখ্যা জড়ো করতে পেরেছে তাই নয়, বহু সপ্তাহ ধরে দিল্লি দখলে রাখা ও ক্রমাগত হামলা করে ইউরোপীয় সৈন্যদের হয়রান করতে পারার চেতনায় এবং সেই সঙ্গে সমগ্র আর্মিতে নতুন নতুন বিদ্রোহের সংবাদ এসে পৌঁছনয় নিঃসন্দেহে সিপাহীদের মনোবল বেড়ে গেছে। ক্ষুদ্র সৈন্যবল দিয়ে ইংরেজরা অবশ্যই শহর অবরোধ করে রাখার কথা ভাবতে পারে না, চড়াও হয়ে তা দখল করতে হবে। যাই হোক, যদি পরের নিয়মিত ডাকে দিল্লি অধিকারের সংবাদ না আসে, তাহলে আমরা প্রায় নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আগামী কয়েক মাস ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে সমস্ত গুরুতর ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। পুরোদমে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যাবে ও 'যমুনার গভীর খরস্রোতে' পরিখা ভরে উঠে শহরের উত্তর-পূর্ব দিকটা রক্ষা পাবে আর ৭৫ ডিগ্রি থেকে ১০২ ডিগ্রি তাপমাত্রার সঙ্গে গড়ে নয় ইঞ্চি বারিপতন মিলে ইক্ষরোপীয়দের ছারখার করবে খাঁটি এশীয় কলেরা। তখন সঠিক প্রমাণিত হবে লর্ড এলেনবরোর এই কথা :

'আমার মতে স্যার এইচ. বার্নার্ড যেখানে আছেন সেখানে থাকতে পারেন না — আবহাওয়ার কারণেই তা বারণ। প্রবল বর্ষা শুরু হলে তিনি মিরাট, আম্বালা ও পঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, খুব একটা সংকীর্ণ ভূমিখণ্ডে আটকা পড়বেন তিনি, এবং এমন পরিস্থিতিতে পড়বেন যেটা বিপজ্জনক একথা বলছি না, কিন্তু যার একমাত্র পরিণাম সর্বনাশ ও ধ্বংস। আশা করি উনি সময় থাকতেই ফিরে যাবেন।'

দিল্লির ব্যাপারে তাই সবকিছুই নির্ভর করছে জুনের শেষ সপ্তাহের মধ্যে দিল্লি আক্রমণ শুরু করার মতো যথেষ্ট সৈন্য ও গোলাবারুদের জোগান জেনারেল বার্নার্ড পেলেন কিনা সেই প্রশ্নের ওপর। অন্যদিকে, তাঁর পশ্চাদপসরণে অভ্যুত্থানের নৈতিক বল অপরিসীম বাড়িয়ে দেবে এবং সম্ভবত প্রকাশ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ আর্মির অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়াও নিশ্চিত করে তুলবে।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ৪ আগস্ট লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫০৯৪ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ১৮ আগস্ট প্রকাশিত

* মোক্ষম আঘাত — সম্পাঃ।
* এই সংকলনের ৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য — সম্পাঃ।
* প্রসঙ্গত — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ভারতে অভ্যুত্থান

লন্ডন, ১৪ আগস্ট, ১৮৫৭

৩০ জুলাই ক্রিয়েস্ট টেলিগ্রাফ যোগে এবং ১ আগস্ট ভারতীয় ডাকে যখন ভারতীয় সংবাদ* প্রথম এসে পৌঁছয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার তারিখ ও বিষয়বস্তু থেকে আমরা দেখাই যে, দিল্লি দখলের কথাটা একটা শোচনীয় ধাপ্পা, অবিস্মরণীয় সেভাস্তপল পতনেরই একটা অতি নিকৃষ্ট অনুকরণ। কিন্তু জন বুলের বিশ্বাসপ্রবণতার গভীরতা এতই অতল যে তার মন্ত্রীরা, তার স্টকহোল্ডাররা ও তার সংবাদপত্র বস্তুতপক্ষে যোগসাজশ করে তাকে বুঝিয়ে দিল যে, জেনারেল বার্নার্ডের নিতান্ত আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের কথা যে সংবাদের ফাঁস হচ্ছে ঠিক সেইটাই নাকি তার শত্রুদের পরিপূর্ণ উচ্ছেদের সাক্ষ্য বহন করছে। দিনে দিনে তার বিভ্রম বাড়তে লাগল এবং অবশেষে তা এমন গাঢ় হয়ে উঠল যে অনুরূপ ব্যাপারে ঝানু ওস্তাদ জেনারেল স্যার দ্য লেসি এভান্স পর্যন্ত কমন্স সভার করতালি ধ্বনির মধ্যে এ ঘোষণা করতে প্ররোচিত হলেন যে, দিল্লি দখলের গুজবটা তিনি সত্যি বলে বিশ্বাস করেন। এই হাস্যকর প্রদর্শনীর পর কিন্তু বুদ্বুদ ফাটার জন্যে পেকে ওঠে এবং পরের দিন, ১৩ আগস্ট ক্রিয়েস্ট ও মার্সাই থেকে, ভারতীয় ডাকের পূর্বাভাস দিয়ে, পর পর টেলিগ্রাফ সংবাদ এসে পৌঁছল ও এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশই রাখল না যে ২৭ জুন তারিখেও দিল্লি যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে, এবং জেনারেল বার্নার্ড তখনো আত্মরক্ষায় সীমাবদ্ধ আর অবরুদ্ধদের বারম্বার প্রবল হামলায় ব্যতিব্যস্ত হয়েও ভারি খুশি যে সে সময় পর্যন্ত স্বভূমিতে তিনি টিকে থাকতে পেরেছেন।

আমাদের ধারণা পরের ডাকে খুব সম্ভব ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ বা অন্তত এই ধরনের পশ্চাদগতির আভাস দেওয়া ঘটনার খবর আসবে। দিল্লির দেওয়ালটা এত লম্বা যে তার সবখানিতে কার্যকরীভাবে সৈন্য বহাল রাখা সম্ভব এ বিশ্বাস করা চলে না, বরং সৈন্য-পুঞ্জীভূত করে আচমকা চালানো একটা৮হ্ন্ধ প্র নঁ-এরই সুযোগ পাওয়া যায় তাতে, একথা নিশ্চিত। কিন্তু যেসব দুঃসাহসী উৎকেন্দ্রিকতায় স্যার চার্লস নেপিয়ার এশীয় মানসকে বজ্রাহত করতে পারতেন, তেমন কিছুর দিকে ঝোঁকার বদলে জেনারেল বার্নার্ড যেন সুরক্ষিত শহর আর অবরোধ আর গোলাবর্ষণের ইউরোপীয় ধারণায় আচ্ছন্ন বলে মনে হয়। বস্তুত তাঁর সৈন্যদল প্রায় ১২,০০০ সৈন্যে বেড়ে উঠেছে বলে শোনা যাচ্ছে — ৭,০০০ ইউরোপীয় ও ৫,০০০ ‘বিশ্বস্ত দেশীয়’, কিন্তু অন্যদিকে বিদ্রোহীরা যে প্রতিদিন নতুন নতুন সৈন্যের যোগান পাচ্ছিল তাও অস্বীকার করা হয়নি, ফলে সত্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অবরোধকারী ও অবরুদ্ধদের মধ্যে সংখ্যাগত বিষমানুপাত

সমানই থেকে গেছে। তাছাড়া, যে একমাত্র জায়গার উপর আচমকা চড়াও হয়ে জেনারেল বার্নার্ড নির্ভুল সাফল্য নিশ্চিত করতে পারেন, সেটা হল মোগল প্রাসাদ, এটির অবস্থান চতুষ্পার্শ্বকে শাসিত করার মতো, কিন্তু যে বর্ষাকাল এসে পড়ার কথা তার ফলে নদীর দিক থেকে প্রাসাদে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়বেই, আর নদী ও কাশ্মীর গেটের মাঝখান দিয়ে আক্রমণ করলে যদি ব্যর্থতা ঘটে তবে ভয়ানক ঝুঁকি পোয়াতে হবে আক্রমণকারীদের। পরিশেষে বর্ষাকালের ফলে নিশ্চিতই যোগাযোগ ও পশ্চাদপসরণের পথটাকে নিরাপদ রাখাই হবে জেনারেলের যুদ্ধক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য। সংক্ষেপে, আরো ভালো মরশুমে তিনি যা থেকে বিরত ছিলেন, বছরের সবচেয়ে অকার্যকরী সময়টায়, তখনো অপ্রতুল সৈন্যবল নিয়ে তিনি ঠিক সেই ঝুঁকিটায় সাহস করবেন তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখি না। যে বিজ্ঞ অন্ধতায় লন্ডন প্রেস নিজেরা বোকা সাজতে চাইছে তা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ মহলে যে গুরুতর আশঙ্কা পোষণ করা হচ্ছে তা দেখা যাবে লর্ড পামারস্টোনের মুখপত্র The Morning Post (৪২) থেকে। এ পত্রিকার সেবাদাস ভদ্রলোকেরা জানাচ্ছেন :

‘এর পরে এমন কি সামনের ডাকেও যে দিল্লি দখলের সংবাদ মিলবে তাতে আমাদের সন্দেহ আছে, কিন্তু আমরা অবশ্যই আশা করি যে, অবরোধকারীদের সঙ্গো যোগ দেবার জন্য যে সৈন্যরা এখন এগুচ্ছে তারা পৌঁছনোর সঙ্গো সঙ্গোই, যথেষ্ট বড়ো কামান থাকলে — যার সংখ্যা এখনো অপ্রতুল বলে মনে হয় — আমরা বিদ্রোহীদের ঘাঁটি পতনের খবর পাব।’

এ কথা পরিষ্কার যে দুর্বলতা, দোদুল্যমানতা ও সরাসরি আহাম্মুকি করে ব্রিটিশ জেনারেলরা দিল্লিকে ভারতীয় বিদ্রোহের রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রের মর্যাদায় তুলে দিয়েছে। দীর্ঘ অবরোধের পর ইংরেজ আর্মির পশ্চাদপসরণ অথবা মাত্র আত্মরক্ষা চালিয়ে যাওয়াকে ধরা হবে ডাহা পরাজয় বলে এবং একটা সাধারণ অভ্যুত্থানের সঙ্কেত দেবে তা। তাচাড়া একটা ভয়ঙ্কর মড়কের বিপদ ঘনাবে ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে — এখনো পর্যন্ত তা থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে হামলা ও সংঘাতসঙ্কুল একটা অবরোধের মহা উত্তেজনায় এবং অচিরেই শত্রুদের ওপর রক্তাক্ত প্রতিশোধ তোলার আশায়। আর ব্রিটিশ শাসনের প্রতি হিন্দুদের উদাসীনতা বা চাই কি দরদের যে সব কথা তা একান্ত অর্থহীন। খাঁটি এশীয়বাসীর মতো রাজন্যরা তাদের সুযোগের অপেক্ষায় আছে। মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় কর্তৃক যেখানে তারা বশীভূত নয় সেখানেই গোটা বাঙলা প্রেসিডেন্সি জুড়ে জনগণ একটা সানন্দ নৈরাজ্য ভোগ করছে, এমন কেউ নেই যার বিরুদ্ধে উত্থিত হতে পারে তারা। ভারতীয় বিদ্রোহের কাছ থেকে ইউরোপীয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য আশা করা হবে একটা তাজ্জবা ভ্ল্২ত্র= ভ্র=*.

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সৈন্যবাহিনী এখনো পক্ষ ঘোষণা না করায় জনগণও অবশ্যই চঞ্চল হয়নি। শেষ পর্যন্ত পঞ্জাবই এই মুহূর্ত পর্যন্ত ইউরোপীয় সৈন্যদের প্রধান কেন্দ্রীয় ঘাঁটি, তার দেশীয় সৈন্যদল নিরস্ত্র। তাকে জাগাতে হলে আশেপাশের আধাস্বাধীন রাজাদের দিয়ে পাল্লা ভারি করা চাই। কিন্তু বেঙ্গল আর্মির মধ্যে যে বিশদ ষড়যন্ত্র দেখা গেল তা যে দেশীয়দের গোপন প্রশ্রয় ও সমর্থন ছাড়া এত বিপুল আকারে চালানো যেত না তা যেমন নিশ্চিত, সরবরাহ ও যোগাযোগ পেতে ইংরেজদের যে মহা অসুবিধায় পড়তে হয় — তাদের সৈন্যদের মন্থর জমায়েতের প্রধান কারণ — তাও তেমনি কৃষক সম্প্রদায়ের অনুকূল মনোভাবের লক্ষণ নয়।

টেলিগ্রাফিক ডিসপ্যাচের অন্যান্য খবর এই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে তাতে দেখা যায় যে, বিদ্রোহ জাগছে পঞ্জাবের একেবারে শেষ প্রান্তে, পেশোয়ারে, এবং অন্যদিকে তা দিল্লি থেকে দক্ষিণে দ্রুত এগুচ্ছে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দিকে, ঝাঁসি, সাগর, ইন্দোর, মহাও-এর মধ্য দিয়ে, অবশেষে পৌঁছচ্ছে ঔরঙ্গাবাদে, যা বোম্বাইয়ের ১৮০ মাইল উত্তর-পূর্বে। বুন্দেলখণ্ডের ঝাঁসি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এটি সুরক্ষিত শহর এবং তার ফলে হয়ে উঠতে পারে সশস্ত্র বিদ্রোহের আর একটি কেন্দ্র। অন্যদিকে বলা হচ্ছে, জেনারেল ভ্যান কোর্টল্যান্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দিল্লির সম্মুখে জেনারেল বার্নার্ডের সৈন্যদের সঙ্গো মিলিত হবার পথে সিরসায় বিদ্রোহীদের পরাস্ত করেছেন — দিল্লি থেকে তিনি তখনো ১৭০ মাইল দূরে। তাঁকে আসতে হবে ঝাঁসি হয়ে, সেখানে ফের সম্মুখীন হতে হবে বিদ্রোহীদের। আর ইংলন্ডীয় সরকারের প্রস্তুতির ব্যাপারে, লর্ড পামারস্টোন বোধ হয় যেন ভাবে, সবচেয়ে ঘোরানো পথটাই সবচেয়ে হ্রস্ব এবং সেই কারণে মিশরের মধ্য দিয়ে সৈন্য না

পাঠিয়ে তিনি সৈন্য পাঠাচ্ছেন উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়ে। চিনের জন্য নির্দিষ্ট কয়েক হাজার সৈন্যকে সিংহলে থামিয়ে পাঠানো হয় কলকাতার দিকে যেখানে ৫ নং ফিউজিলিয়াররা আসলে এসে পৌঁছয় ২ জুলাই — এই ঘটনাটাকে উপলক্ষ করে তিনি তাঁর বাধ্য বিনীত কমন্স সভ্যদের সেই সব লোককে নিয়ে একটু কুৎসিত উপহাস করেন, যাঁরা তাঁর চিন যুদ্ধকে এখনো ঠিক 'সৌভাগ্য' নয় বলে সন্দেহ করার সাহস রাখেন।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ১৪ আগস্ট লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১০৪ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ২৯ আগস্ট প্রকাশিত

* দিল্লি পতনের ভুয়া খবরের কথা বলা হচ্ছে (এই সংকলনের ৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) — সম্পাঃ।

* ভ্রম — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

কমন্স সভার এবারকার অধিবেশন শেষ হবার পূর্বে সর্বশেষ বৈঠকের আগের বৈঠকটির সুযোগ নিয়ে লর্ড পামারস্টোন কমন্স সভ্যদের কিছুটা ঝাপসা আভাস দান করেছেন, বিদায়ী অধিবেশন ও আগামী অধিবেশনের মাঝখানটুকুতে ইংরেজ জনসাধারণের জন্য কী খেল তিনি মজুত রেখেছেন। তাঁর কর্মসূচির প্রথম দফাটা হল পারস্য যুদ্ধের পুনরারম্ভ — ৪ মার্চে নিষ্পন্ন শান্তি চুক্তি বলে যে যুদ্ধটা নিশ্চিতই শেষ হয়ে গেছে বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন কয়েক মাস আগে। পারস্য উপসাগরে মোতায়েন সৈন্যসামন্ত নিয়ে কর্ণেল জেকবকে ভারতে ফেরার আদেশ দেওয়া হচ্ছে, জেনারেল দ্য লেসি এভান্স এই আশা প্রকাশ করার পর লর্ড পামারস্টোন পরিষ্কার বলে দিলেন যে, পারস্য চুক্তিবদ্ধ দায়িত্বগুলি পালন করা পর্যন্ত কর্ণেল জেকবের সৈন্য অপসারণ করা যাবে না। হেরাত কিন্তু এখনো ছেড়ে আসা হয়নি। বরং গুজব ছিল যে হেরাতে আরো সৈন্য পাঠিয়েছে পারস্য। এ কথা অবশ্য প্যারিসের পারসিক রাষ্ট্রদূত অস্বীকার করেছেন, কিন্তু পারস্যের সততায় ন্যায়তই মহা সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে এবং সেই কারণে কর্ণেল জেকবের অধীনস্থ ব্রিটিশ সৈন্য বুশায়ার দখল করেই থাকবে। লর্ড পামারস্টোনের বিবৃতির পরদিনই টেলিগ্রাফ ডিসপ্যাচে এই খবর আসে যে, মিঃ মারি হেরাত থেকে সৈন্যাপসরণের সোজাসাপটা দাবি চাপিয়েছেন পারস্য সরকারের ওপর — এ দাবিটাকে একটা নতুন যুদ্ধ ঘোষণার অগ্রদূত বলে খুবই ধরা যায়। ভারতীয় বিদ্রোহের এই হল প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া।

লর্ড পামারস্টোনের কর্মসূচির দ্বিতীয় দফায় খুঁটিনাটির যে অভাব আছে তা পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচিত করে। ইংলন্ড থেকে একটা বৃহৎ সামরিক শক্তি উঠিয়ে নিয়ে ভারতে পাঠানোর কথা যখন তিনি প্রথম ঘোষণা করেন, তখন গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা-শক্তি হরণ ও এইভাবে তার দুর্বল অবস্থার সুযোগ গ্রহণে পরদেশগুলিকে সুবিধাদানের অভিযোগ যাঁরা করেছিলেন সে বিরোধীদের তিনি জবাব দেন যে :

'গ্রেট বৃটেনের জনগণ এমন কোনো কর্ম কখনো সহ্য করবে না, যে কোনো আপদাবস্থাই আসুক তন্মুহূর্তে ও দ্রুত যথেষ্ট লোক জোগাড় করা হবে।'

পার্লামেন্টের এবারকার অধিবেশন বন্ধ হবার প্রাক্কালে কিন্তু তিনি কথা বলছেন একেবারে ভিন্ন সুরে। ভারসে সৈন্য পাঠানো হোক স্ক্রু-চালিত লাইন-যুদ্ধজাহাজে, জেনারেল দ্য লেসি এভান্সের এই পরামর্শের জবাবে তিনি আগের মতো স্ক্রু-চালিত জাহাজের চেয়ে পাল-তোলা জাহাজের উৎকর্ষ দাবি করেননি, বরং স্বীকার করেন যে, জেনারেলের পরিকল্পনা প্রথম দৃষ্টিতে খুবই সুবিধাজনক। তবু কমন্স সভার মনে রাখা উচিত যে :

'স্বদেশে যথেষ্ট সামরিক ও নৌসৈন্য রাখার ন্যায্যতার দিক থেকে অন্য কিছু বিবেচনার কথাও মনে রাখতে হবে। ... যতটুকু একান্ত আবশ্যক তার বেশি নৌশক্তি দেশ থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার অনুপযুক্ততার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করছে কতকগুলি অবস্থা। বাষ্প-চালিত লাইন-যুদ্ধজাহাজগুলো অবশ্য এমনিই দাঁড়িয়ে আছে, বর্তমানে তাদের খুব একটা কাজ নেই। কিন্তু যা ইঙ্গিত করা হয়েছে তেমন কিছু ঘটনা যদি ঘটে এবং এরা তাদের নৌবল যদি সমুদ্রে পাঠাতে চায় তাহলে যে বিপদ ঘনিয়েছে তা এরা ঠেকাবে কী করে যদি এদের লাইন-যুদ্ধজাহাজগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয় ভারতের জন্য পরিবহনের কাজে? যে নৌবাহিনীকে ইউরোপে ঘটা পরিস্থিতির জন্য অতি অল্প নোটিসে নিজ প্রতিরক্ষার জন্য সশস্ত্র করার প্রয়োজন হতে পারে, তাকে যদি এরা ভারতে পাঠায় তবে ভয়ানক ভুল করবে।'

অস্বীকার করা যাবে না যে লর্ড পামারস্টোন এক অতি সূক্ষ্ম উভয়-সংকটের মধ্যে ফেলেছেন জন বুলকে। ভারতীয় বিদ্রোহকে চূড়ান্ত রূপে দমনের জন্য পর্যাপ্ত উপায় যদি সে ব্যবহার করে তবে স্বদেশে সে আক্রান্ত হবে, এবং যদি ভারতীয় বিদ্রোহকে সে সংহত হতে দেয় তাহলে, মিঃ ডিজরেলি যা বলেছেন, 'মঞ্চে দেখা দেবে ভারতের দেশীয় রাজন্যরা ছাড়াও অন্যান্য চরিত্র, যাদের মোকাবিলা করতে হবে।'

অমন রহস্যজনকভাবে ইঙ্গিত করা 'ইউরোপীয় পরিস্থিতির' ওপর দৃষ্টিপাত করার আগে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যের আসল অবস্থা সম্পর্কে কমন্স সভার এ অধিবেশনে যেসব স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলি জড়ো করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমত, হঠাৎ দিল্লি অধিকারের সমস্ত শুভ আশা যেন একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া করে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল এবং আগেকার দিনগুলোর বড়ো বড়ো প্রত্যাশা নেমে এল এই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত অভিমতে যে নভেম্বরে, দেশ থেকে পাঠানো সৈন্যবলের জোগান যখন ঘটকে ততদিন পর্যন্ত ইংরেজরা যদি নিজেদের ঘাঁটি আগলে থাকতে পারে তাহলেই ধন্য বোধ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি কানপুর হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশঙ্কাও বেরিয়ে এসেছে, মিঃ ডিজরেলির কথা মতো এই কানপুরের ভাগ্যের ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে, এবং কানপুরে সাহায্যদান তাঁর মতে দিল্লি অধিকারের চাইতেও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। গঙ্গার ওপরে এর মাঝামাঝি অবস্থিতি, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, গোয়ালিয়র ও বুন্দেলখণ্ডের ওপর তার প্রভাব এবং দিল্লি অভিমুখে একটা অগ্রণী কেল্লা হিসাবে তার ভূমিকায় কানপুর বস্তুত বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধান গুরুত্বের একটা স্থান। পরিশেষে, কমন্স সভার অন্যতম সামরিক সদস্য স্যার এফ স্মিথ এই ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তাঁদের ভারতীয় আর্মিতে আসলে কোনো ইঞ্জিনিয়র ও স্যাপার নেই, তারা সকলেই দলত্যাগ করে চলে গেছে এবং 'দিল্লির একটা দ্বিতীয় সারাগোস্‌সায়' (৪৩) পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে লর্ড পামারস্টোন ইংলন্ড থেকে ইঞ্জিনিয়র কোরের কোনো কোনো অফিসার বা লস্কর পাঠাতে অবহেলা করেছেন।

এবার 'ভবিষ্যতে আসন্ন' বলে কথিত ইউরোপীয় ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে এলে সঙ্গে সঙ্গেই অবাক হতে হয় পামারস্টোনের ইঙ্গিতগুলির ওপর লন্ডন টাইমস-এর মন্তব্যে। দ্য টাইমস বলছে, ফরাসি সংবিধান উৎখাত হতে পারে, জীবননাট্য থেকে বিদায় নিতে পারেন নেপোলিয়ন, এবং সেক্ষেত্রে বর্তমান নিরাপত্তার যা ভিত্তি সেই ফরাসি মৈত্রী শেষ হয়ে যাবে। অন্য কথায়, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মহা মুখপত্র দ্য টাইমস মনে করছে যে, কোনো দিন ফ্রান্সে একটা বিপ্লব ঘটা অসম্ভব ব্যাপার নয় এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, বর্তমান মৈত্রীটা ফরাসি জনগণের সহানুভূতির ওপর নয়, প্রতিষ্ঠিত ফরাসি জবরদখলির সঙ্গে নিতান্ত একটা ষড়যন্ত্রের ওপর। ফ্রান্সে একটা বিপ্লব ছাড়াও রয়েছে ডানিউব কলহ (৪৪)। মলদাভীয় নির্বাচন নাকচ করায় তা থামেনি, শুধু নতুন একটা পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। সর্বোপরি রয়েছে স্ক্যান্ডিনাভীয় উত্তর, অদূর ভবিষ্যতে তা নিশ্চিতই মহা উত্তেজনার মঞ্চ হয়ে দাঁড়াবে এবং হয়ত বা ইউরোপে একটা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের সংকেত দেবে। উত্তরে এখনো শান্তি বহাল আছে, কারণ উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করা হচ্ছে দুটি ঘটনার — সুইডেনের রাজার* মৃত্যু এবং ডেনমার্কের বর্তমান রাজার সিংহাসন ত্যাগ। খ্রিস্টিয়ানিয়ায় প্রকৃতিবিদদের একটা বিগত সভায় সুইডেনের বংশানুক্রমিক যুবরাজ** একটা স্ক্যান্ডিনাভীয় ইউনিয়নের পক্ষে সুদৃঢ় অভিমত দেন। ইনি এখন জীবনের শুরুতে, দৃঢ়সংকল্প ও উদ্যোগী চরিত্রের লোক, তাই যে স্ক্যান্ডিনাভীর পার্টিটির সভ্যসাধারণের মধ্যে রয়েছে

সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের উদ্যমশীল যুবজন — সে পার্টি এঁর সিংহাসনারোহণটাই অস্ত্রধারণের শুভক্ষণ বলে ভাববে। অন্যদিকে দুর্বল ও অথর্ব দিনেমার রাজ সপ্তম ফ্রেডারিক নাকি অবশেষে তাঁর অনুলোমা মহিষী কাউন্টেস দানার-এর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যাবার — এ অনুমতি এতদিনও তাঁর মেলেনি। এঁরই জন্যে রাজার খুড়া ও দিনেমার সিংহাসনের দাবিদার উত্তরাধিকারী প্রিন্স ফার্ডিন্যান্ডকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে অবসরগ্রহণ করতে হয়, পরে তাতে ফিরে আসেন তিনি রাজ পরিবারের অন্যান্য লোকেদের একটা বন্দোবস্তের ফলে। এই মুহূর্তে কাউন্টেস দানার নাকি কোপেনহেগেন বাস বদলাতে রাজী প্যারিস বাসের জন্য, এমন কি প্রিন্স ফার্ডিন্যান্ডের হাতে রাজদণ্ড সমর্পণ করে রাজনৈতিক জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে বিদায় নেবার জন্য রাজাকে প্ররোচিত করতেও সম্মত। প্রায় ৬৫ বছর বয়সের এই প্রিন্স ফার্ডিন্যান্ড কোপেনহেগেন রাজদরবারের প্রতি চিরকাল ঠিক সেই একই ব্যবহার করে এসেছেন, যা তুইলেরিদের দরবারের প্রতি করেন অর্তেয়ের কাউন্ট, পরে দশম চার্লস। জেদী, কঠোর ও রক্ষণশীল বিশ্বাসে একনিষ্ঠ এই লোকটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আনুগত্য ঘোষণার স্তরে কখনো নামেননি। অথচ তাঁর সিংহাসন আরোহণের প্রথম শর্তই হবে যা তিনি প্রকাশ্যে ঘৃণা করেন সেই সংবধানটিকেই শপথ করে স্বীকার। এই কারণেই আন্তর্জাতিক গোলমালের সম্ভাবনা, স্ক্যান্ডিনাভীয় পার্টি — সুইডেন ও ডেনমার্ক উভয় ক্ষেত্রেই — তা থেকে নিজ ফায়দা তোলায় দৃঢ়সংকল্প। অন্যদিকে, ডেনমার্কের সঙ্গে হলস্টেইন ও শ্লেসভিগ্ — জার্মান এই দুটো ডাচির (৪৫) বিরোধে, এদের দাবি সমর্থন করছে প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া, অবস্থা আরো জটিল হবে এবং তাতে জার্মানি জড়িয়ে পড়বে উত্তরের আলোড়নে, এদিকে ১৮৫২ সালের যে লন্ডন চুক্তিতে ডেনমার্কের সিংহাসন প্রিন্স ফার্ডিন্যান্ডের জন্য নির্দিষ্ট হয় তার ফলে রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলন্ডও জড়িয়ে পড়বে।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ২১ আগস্ট লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১১০ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

* অস্কার প্রথম — সম্পাঃ।
** চার্লস ল্যুদভিগ ইউগেন্ — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

*ভারতে জলুমের তদন্ত (৪৬)

ভারতীয় বিদ্রোহ সম্পর্কে আমাদের যে লন্ডন সংবাদদাতার চিঠি গতকাল আমরা প্রকাশ করেছি, তাতে অতি সঙ্গতভাবেই এমন কতকগুলি পূর্ব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যা এই প্রচণ্ড অভ্যুত্থানের পথ তৈরি করে। আজকে আমরা কিছুটা সেই চিন্তাধারাই অনুবর্তন করে দেখাতে চাই যে ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা বিশ্বকে যা বোঝাতে চান, ভারতীয় জনগণের তেমন নিরীহ ও নিষ্কলঙ্ক হিতৈষী তাঁরা মোটেই নন। এই উদ্দেশ্যে আমরা পূর্ব ভারতীয় জুলুম প্রসঙ্গে সরকারি ব্লু বুকের (৪৭) আশ্রয় নেব, ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সালের অধিবেশনে কমন্স সভার সামনে এ দলিল প্রকাশ করা হয়েছিল। দেখা যাবে যে সাক্ষ্যটা এমনই যে তার প্রতিবাদ অসম্ভব।

প্রথমে নিচ্ছি মাদ্রাজের জুলুম কমিশনের রিপোর্ট (৪৮), এতে ‘রাজস্বের ব্যাপরে সাধারণভাবে জুলুমের অস্তিত্বে বিশ্বাস’ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

‘রাজস্ব অনাদায়ের অপরাধে যত লোককে উৎপীড়ন করা হয় ফৌজদারী দায়ে তত লোককে উৎপীড়ন করা হয় কিনা সন্দেহ’।

ঘোষণা করা হয়েছে যে,

'জুলুম যে চলে তার চেয়েও একটা ব্যাপার কমিশনকে বেশি ব্যথিত করেছে : সে হল ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের প্রতিবিধান লাভের দুষ্করতা।' এ দুষ্করতার কারণ কমিশন দিয়েছেন : (১) কলেক্টরের কাছে ব্যক্তিগতভাবে যারা নালিশ করচে চায় তাদের যতটা পথ অতিক্রম করতে ও কলেক্টরের অফিসে পৌঁছতে যে খরচা ও সময় ব্যয় হয়, (২) এই আশঙ্কা পাছে পত্রযোগে দরখাস্ত 'একটা সাধারণ স্বাক্ষরে পাঠানো হবে তহশীলদার' — জেলা পুলিস ও রাজস্ব অফিসারের কাছে — অর্থাৎ ঠিক সেই লোকের কাছে যারা নিজেরা অথবা তাদের অধঃস্তন পুলিস কর্মচারী মারফত তার প্রতি অন্যায় করেছে, (৩) সরকারি অফিসাররা যখন এই ধরনের আচরণের নালিশে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হন তখনও আইনানুসারে তাঁদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো বা শাস্তি দেবার অকার্যকরী ব্যবস্থা। দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের একটা অভিযোগ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রমাণিত হলেও তার শাস্তি কেবল পঞ্চাশ টাকা জরিমানা বা এক মাস কারাদণ্ড। উপায়ান্তর হল অভিযুক্তকে 'শাস্তির জন্য ফৌজদারী জজের হাতে' তুলে দেওয়া 'অথবা সার্কিট আদালতের কাছে বিচারের জন্য পেশ করা।'

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে,

'মনে হয় যে এইসব মোকদ্দমা বিরক্তিকর, শুধু একধরনের দোষেই — কর্তৃত্বের অপব্যবহারের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য, যথা পুলিসী চার্জে, এবং এ সম্পর্কে যা আবশ্যক তার পক্ষে তা একেবারেই অপর্যাপ্ত।'

পুলিস বা রাজস্ব অফিসার একই ব্যক্তি, কারণ রাজস্ব আদয় করে পুলিস, তার বিরুদ্ধে জুলুম করে টাকা আদায়ের নালিশ এলে তা প্রথমে বিচার করেন সহকারী কলেক্টর, সে তারপর আপিল করতে পারে কলেক্টরের কাছে এবং তারপর রাজস্ব বোর্ডে। বোর্ড তার মামলা পাঠাতে পারে সরকারি অথবা দেওয়ানি আদালতে।

'আইনের এই অবস্থায় দারিদ্র্য-পীড়িত কোনো রায়ত কোনো ধনী রাজস্ব কর্মচারীর বিরুদ্ধে লড়তে পারে না, এবং এই দুই বিধি বলে (১৮২২ ও ১৮২৮ সালের) আনীত কোনো অভিযোগের কথা আমাদের গোচরে আসেনি।'

তাছাড়া জুলুমবাজী আদায় প্রযোজ্য শুধু সরকারি টাকা হস্তগত করলে, অথবা রায়তের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায় করে অফিসারের পকেটস্থ হলে। সুতরাং সরকারি রাজস্ব আদায়ে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনো বৈধ শাস্তির ব্যবস্থাই নেই।

এ সব উদ্ধৃতি যে রিপোর্ট থেকে, তা শুধু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রযোজ্য। কিন্তু স্বয়ং লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে ডিরেক্টরদের* নিকট পত্রে লেখেন যে,

'প্রতিটি ব্রিটিশ প্রদেশেই যে অধঃস্তন কর্মচারীরা কোনো না কোনো আকারে জুলুম প্রয়োগ করে সে বিষয়ে বহুদিন থেকেই তিনি নিঃসন্দেহ।'

ব্রিটিশ ভারতের আর্থিক প্রথা হিসাবে জুলুমের সার্বজনীন অস্তিত্ব এই রূপে সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু সে স্বীকৃতি এমন যাতে খোদ ব্রিটিশ সরকারকে তা আড়াল করে। বস্তুতপক্ষে, মাদ্রাজ কমিশনের সিদ্ধান্ত হল এই যে, জুলুম সম্পূর্ণই অধঃস্তন হিন্দু কর্মচারীদের দোষ এবং সরকারের ইউরোপীয় কর্মচারীরা সর্বদাই, যদি নিষ্ফলভাবে, তা রোধের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। এ উক্তির জবাবে মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন ১৮৫৬ সালের জানুয়ারিতে পার্লামেন্টের নিকট এক আবেদনে জুলুম কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নিম্নোক্ত কারণে : (১) আদৌ কোনো তদন্ত প্রায় হয়নি, কমিশন শুধু মাদ্রাজে বসে ছিলেন তাও কেবল তিন মাসের জন্য, অথচ নিতান্ত অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া যাদের নালিশ ছিল সে সব দেশীয়ের পক্ষে বাড়ি ছেড়ে আসা ছিল অসম্ভব, (২) কমিশনাররা অন্যায়ের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেননি, তা করলে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাটাই যে মূলে, তা ধরা পড়ত, (৩) অভিযুক্ত দেশীয় কর্মচারীদের উপরওয়ালারা এ অনাচারের সঙ্গে কতটা পরিচিত তার কোনো অনুসন্ধান করা হয়নি।

আবেদনকারীরা বলেন, 'এ জবরদস্তির মূল তার প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠাতাদের মধ্যে নয়, তা নেমে এসেছে তাদের আশু উপরওয়ালাদের কাছ থেকে, যারা আবার নির্ধারিত পরিমাণ আদায়ের জন্য তাদের ইউরোপীয়

উপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, এই ইউরোপীয় উপরওয়ালারাও আবার সেই বাবদে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী।’

বস্তুতপক্ষে, মাদ্রাজ রিপোর্ট যার ওপর ভিত্তি করার দাবি করেছে সেই সাক্ষ্যের কিছু উদ্ধৃতি দিলেই ‘ইংরেজদের কোনো দোষ নেই’ এ উক্তি খণ্ডিত হবে। যেমন, জনৈক বণিক মিঃ ডবলিউ. ডি. কোলহফ বলেন :

‘জুলুমের বিভিন্ন ধরন এবং তা চলে তহশীলদার ও তার অধঃস্তনদের খেয়াল মাফিক, কিন্তু উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় কিনা তা আমার পক্ষে বলা শক্ত, কেননা তদন্ত ও জ্ঞাতার্থে সমস্ত নালিশই সাধারণত পাঠানো হয় তহশীলদারের কাছে।’

দেশীয়দের কাছ থেকে নালিশের ঘটনাবলীর মধ্যে পাই :

‘গত বছর আমাদেরপিসনাম (প্রধান ধান্য ফসল) অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হওয়ায় আমরা বরাবরের মতো খাজনা দিতে পারিনি। জমাবন্দির সময় ১৮৩৭ সালে মিঃ ইডেন আমাদের কলেক্টর থাকা কালে যে চুক্তি হয় তার শর্তানুসারে আমরা এই ক্ষতির জন্য একটা রেহাই দাবি করি। এ রেহাই না দেওয়ায় আমরা পাট্টা নিতে অস্বীকার করি। তহশীলদার তখন জুন থেকে আগস্ট মাসে ভয়ানক কড়াভাবে আমাদের টাকা দিতে বাধ্য করতে শুরু করে। আমাকে এবং আর সকলকে যেসব লোকের জিম্মায় দেওয়া হয়, তারা আমাদের রোদ্দুরে টেনে নিয়ে যেত। আমাদের হামা দিতে হত, পিঠের ওপর চাপানো হত পাথর, জ্বলন্ত বালিতে রাখা হত আমাদের। ৮টার পর আমাদের ধান খেতে যাবার ছাড়া পেতাম। এই নির্যাতন চলে তিন মাস ধরে। তার ভেতর আমরা মাঝে মাঝে কলেক্টরের কাছে দরখাস্ত দিতে গেছি, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। দরখাস্ত আমরা দায়রা আদালতের কাছে দিয়ে আপিল করি, আদালত তা পাঠায় কলেক্টরের কাছে তবু কোনো ন্যায় বিচার হয় না। সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের ওপর একটা নোটিশ হয় এবং পঁচিশ দিন পরে আমাদের সম্পত্তি ক্রোক ও পরে বিক্রি হয়। যা বললাম তা ছাড়া আমাদের মেয়েদের ওপর অনাচার হয়, তাদের বুকের ওপর কিত্তি দাগা হয়।’

কমিশনারদের প্রশ্নের উত্তরে একজন দেশীয় খ্রিস্টান বলেন :

‘কোনো ইউরোপীয় বা দেশীয় রেজিমেন্ট যাবার সময় বিনামূল্যে রসদ ইত্যাদি আনার জন্য জোর করা হয় সমস্ত রায়তদের ওপর, কেউ জিনিসের দাম চাইলে তার ওপর দারুণ নির্যাতন করা হয়।’

এরপর একটি ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত আছে : তাঁকে এবং গাঁয়ের ও আশে পাশেরগাঁয়ের সকলকে ডেকে তহশীলদার বিনামূল্যে তক্তা, কাঠকয়লা, লকড়ী ইত্যাদি জোগাতে বলে যাতে তার কোলেরুন সেতু তৈরির কাজ চলে। আপত্তি করায় তাঁকে বারো জন লোক ধরে নানাভাবে নির্যাতন করে। তিনি বলছেন :

‘সাবকলেক্টর মিঃ ডবলিউ. ক্যাডেলের কাছে আমি একটা নালিশ দিই, কিন্তু তিনি কোনো তদন্ত না করেই আমার দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলেন। গরিবদের ঘাড় ভেঙে কোলেরুন সেতুর কাজ শস্তায় সেরে সরকারের কাছে নাম করতে চান বলে তহশীলদার যে খুনই করুক তিনি তাতে কোনো নজর দেন না।’

জুলুম ও জবরদস্তির শেষ মাত্রা পর্যন্ত চালানো অবৈধ অনাচারের প্রতি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কী দৃষ্টিভঙ্গি, তা সবচেয়ে ভালো দেখা যায় ১৮৫৫ সালে পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মিঃ ব্রিরটনেরর মামলায়। পঞ্জাবের চিফ কমিশনারের* রিপোর্ট অনুসারে প্রমাণিত হয় যে,

‘ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং মিঃ ব্রিরটনের সরাসরি জ্ঞাতসারে বা পরিচালনায় সম্পন্ন নাগরিকদের গৃহ বিনা কারণে তল্লাসি করা হয়েছে, সে উপলক্ষে আটক করা সম্পত্তি দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখা হয়েছে, বহু লোককে জেলে পোরা হয়েছে এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেখানে তাদের রাখা হয়েছে কানো অভিযোগ না দেখিয়েই, দুর্বৃত্তদের জামানত সম্পর্কিত আইন প্রয়োগ করা হয়েছে ঢালাও ভাবে ও নির্বিচার কঠোরতায়। জেলায় জেলায় ডেপুটি কমিশনারের অনুগমন করেছে কিছু পুলিস অফিসার ও গোয়েন্দা, কোথাও যেতে হলেই এদের তিনি নিয়োগ করতেন ও এরাই হল অনিষ্টের প্রধান কর্তা।’

এ মামলায় মন্তব্যে লর্ড ডালহৌসি বলেন :

'আমাদের তর্কাতীত প্রমাণ আছে — স্বয়ং ব্রিরটনও যাতে আপত্তি করেননি এমন প্রমাণ — যে চীফ কমিশনার তাঁর বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গ ও আইনভঙ্গের যে-গুরুভার তালিকার অভিযোগ করেছেন, যা ব্রিটিশ প্রশাসনের একাংশের দুর্নাম ঘটিয়েছে এবং বহুসংখ্যক ব্রিটিশ প্রজার উপর যা নিতান্ত অবিচার, স্বেচ্ছাচারী কয়েদ ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চাপিয়েছে, তার প্রত্যেকটি দফাতেই ও-অফিসারটি অপরাধী।'

লর্ড ডালহৌসি একটা 'মহৎ প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন' করতে চান, তাই এই মত দেন যে,

'মিঃ ব্রিরটনের ওপর বর্তমানে ডেপুটি কমিশনারের কর্তৃত্ব উপযুক্তভাবে অর্পণ করা চলে না, তাঁকে ও-পদ থেসক সরানো উচিত প্রথম শ্রেণির অ্যাসিস্টেন্টের পদে।'

ব্লু বুকেরএই উদ্ধৃতির পর উপসংহার টানা যেতে পারে মালাবার উপকূলস্থ কানাড়ার তালুকের অধিবাসীদের দরখাস্ত দিয়ে, সরকারের কাছে কয়েকবার দরখাস্ত পাঠিয়ে কোনো ফল হয়নি এই কথা বলে তারা তাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীত অবস্থার তুলনা দিচ্ছে :

'রাণী, বাহাদুর ও টিপুর আমলে আমরা যখন সরস ও নীরস জমি, পাহাড়ে জমি, নিচু জমি ও বনজঙ্গালে চাষ করা কালে ধার্য লঘু খাজনা দিয়ে সুখে শান্তিতে ছিলাম, তখন তদানীন্তন সরকারি কর্মচারীরা আমাদের ওপর একটা বাড়তি কর চাপায় কিন্তু আমরা তা কখনো দিইনি। রাজস্ব আদায়ে কষ্ট নিপীড়ন বা অনাচার আমাদের সইতে হয়নি। সম্মানীয় কোম্পানির* হাতে এ-দেশ সমর্পণ করার পর তারা আমাদের হাতমূচড়ে টাকা আদায়ের নানা ফন্দি খাটায়। এই কুমতলবে তারা নিয়মকানুন আবিষ্কার করে বিধিবিধান তৈরি করে এবং তা কার্যকরী করার জন্য আদেশ দেয় তাদের কলেক্টর ও দেওয়ানি জজদের। কিন্তু তখনকার কলেক্টর ও তাঁদের অধঃস্তন দেশীয় কর্মচারীরা কিছুকাল আমাদের অভাব অভিযোগের প্রতি যথারীতি মনোযোগ দেন ও আমাদের আকাঙ্ক্ষানুসারে কাজ করেন। কিন্তু বিপরীত পক্ষে, বর্তমান কলেক্টর ও তাঁদের অধঃস্তন কর্মচারীরা যে করেই হোক প্রমোশন পাবার বাসনায় সাধারণভাবে লোকেদের কল্যাণ ও স্বার্থ উপেক্ষা করছেন, আমাদের অভাব অভিযোগ কানে তুলছেন না ও সর্ববিধ নিপীড়ন চালাচ্ছেন আমাদের ওপর।'

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আসল ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত ও নরম-করে-বলা পরিচ্ছেদ দেওয়া গেল। এই সব তথ্য দেখে অনুত্তেজিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হয়ত বা প্রশ্ন হবে, বিদেশী যে বিজয়ীরা এমন করে প্রজাদের ওপর অনাচার চালিয়েছে, তাদের বিতাড়ন করার চেষ্টা করা একটা জাতির পক্ষে যুক্তিযুক্ত কিনা। আর এ সব কাজ ইংরেজরা যদি করে থাকে স্থিত মস্তিষ্কে, তাহলে বিদ্রোহ ও সংঘাতের বিক্ষোভে অভ্যুত্থানী হিন্দুরা যদি তাদের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগে দোষী হয়, সে কি আশ্চর্যের?

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ২৮ আগস্ট লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১২০ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

* ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স — সম্পাঃ।
* জন লরেন্স — সম্পাঃ।
* ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

*ভারতে অভ্যুত্থান

'বালটিক'এর ডাকে ভারতে কোনো নতুন ঘটনার রিপোর্ট নেই, কিন্তু অতি চিত্তাকর্ষক খুঁটিনাটি খবর আছে প্রচুর, পাঠকদের অবগতির জন্য তা আমরা সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছি। লক্ষণীয় প্রথম কথা এই যে, ১৫ জুলাই তারিখেও ইংরেজরা দিল্লি ঢুকতে পারেনি। সেই সঙ্গে তাদের ছাউনিতে কলেরা দেখা দেয়, প্রবল বর্ষা শুরু হচ্ছিল, এবং অবরোধ উত্তোলন ও অবরোধকারীদের অপসরণটা শুধু একটা সময়ের প্রশ্ন বলে মনে হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রেস আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে মড়কে জেনারেল স্যার এইচ. বার্নার্ড মারা গেলেও তাঁর অল্পাহারী ও বহুশ্রমী সৈন্যেরা বেঁচে গেছে। তাই জনসাধারণের নিকট পেশ করা সুস্পষ্ট বিবৃতি থেকে নয়, শুধু স্বীকৃত ঘটনাগুলি থেকে অনুমান করেই আমরা অবরোধকারী সৈন্যদলের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর রোগের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি। দিল্লির সম্মুখস্থ ছাউনির একজন অফিসার ১৪ জুলাই লিখছেন :

'দিল্লি দখলের দিক দিয়ে আমরা কিছুই করছি না, শত্রু হামলার বিরুদ্ধে কেবল আত্মরক্ষা করছি। পাঁচটি ইউরোপীয় রেজিমেন্টের অংশ াাছে আমাদের, কিন্তু কোনো কার্যকরী আক্রমণের জন্য জড়ো করতে পারি কেবল ২,০০০ ইউরোপীয়, প্রতি রেজিমেন্ট থেকে বড়ো বড়ো অংশ রাখা হয়েছে জলন্ধর, লুধিয়ানা, সুবাধু, দাঘশালে, কসৌলি, আম্বালা, মিরাট ও ফিলাউর রক্ষার জন্য। আসলে প্রতি রেজিমেন্টের এক একটা ছোটো অংশই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কামানের দিক দিয়ে শত্রু আমাদের চেয়ে অনেক প্রবল।'

এ থেকে কিন্তু প্রমাণ হয় যে পঞ্জাব থেকে আসা সৈন্যরা দেখে যে, জলন্ধর থেকে মিরাট পর্যন্ত উত্তরের বিরাট যোগাযোগ পথটা বিদ্রোহের অবস্থায় এবং সেই কারণে প্রধান প্রধান ঘাঁটিতে ডিট্যাচমেন্ট রেখে নিজেদের সংখ্যা কমাতে বাধ্য হয়। এ থেকে বোঝা যায় পঞ্জাব থেকে আগত সৈন্যদের প্রত্যাশিত সংখ্যাটা জমায়েত করা যাচ্ছে না, কিন্তু ইউরোপীয় সৈন্যদল ২,০০০-এ নেমে গেল এটার ব্যাখ্যা মেলে না। ৩০ জুলাইয়ের পত্রে লন্ডন টাইমস-এর বোম্বাই সংবাদদাতা অবরোধকারীদের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন আরেক ভাবে। তিনি লিখছেন :

'অতিরিক্ত শক্তি সত্যিই আমাদের শিবিরে পৌঁছিয়েছে — ৮নম্বরের (কিঙস্) একটা অংশ, ৬১ নম্বরের একটা, পদাতিক গোলন্দাজদের একটা কোম্পানি ও দেশীয় গোলন্দাজদের দুটি কামান, ১৪ নং অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট (একটা বৃহৎ অস্ত্র-ট্রেন পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে), ২ নং পঞ্জাব ঘোড়সওয়ার, ১ নং পঞ্জাব পদাতিক ও ৪ নং শিখ পদাতিক, কিন্তু অবরোধকারীদের সঙ্গে এইভাবে যোগ দেওয়া সৈন্যদলের দেশীয় অংশটা পুরোপুরি ও সমানভাবে বিশ্বাসভাজন নয়, যদিও ইউরোপীয়দের সঙ্গে তারা ব্রিগেড করা। পঞ্জাব সৈন্যদের ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্টগুলির মধ্যে খাস হিন্দুস্তান ও রোহিলখণ্ড থেকে বহু মুসলমান ও উচ্চ শ্রেণির হিন্দু আছে আর বাংলা অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অধিকাংশই এই ধরনের লোক। শ্রেণি হিসেবে এরা একান্তই অবিশ্বস্ত এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বেশ একটা সংখ্যায় এদের উপস্থিতি বিব্রতকর হওয়ার কথা — এবং তাই প্রমাণিত হয়েছে। ২ নং পঞ্জাব ঘোড়সওয়ার বাহিনী থেকে জন সত্তর হিন্দুস্তানীকে নিরস্ত্র ও তিনজনকে ফাঁসি দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, তার একজন উপরিওয়ালা দেশীয় অফিসার। ৯ নং অনিয়মিত বাহিনীটি কিছু দিন থেকে সৈন্যদলের সঙ্গে রয়েছে, তাদের কয়েকজন ঘোড়সওয়ার দল ছেড়ে পালিয়েছে, এবং ৪ নং অনিয়মিত ডিট্যাচমেন্ট ডিউটিতে থাকার সময় তাদের অ্যাডজুটেন্টকে খুন করেছে বলে আমার বিশ্বাস।'

এতে আর একটি গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। দিল্লির সামনেকার ছাউনিটা মনে হয় যেন খানিকটা আগ্রামান্তের ছাউনির (৪৯) মতো, ইংরেজদের লড়তে হচ্ছে শুধু সামনের শত্রুদের সঙ্গে নয়, স্ববাহিনীর মধ্যস্থিত মিত্রদের সঙ্গেও। তবু আক্রমণাভিযানের জন্য কেন মাত্র ২,০০০ ইউরোপীয় পাওয়া যাচ্ছে তার যথেষ্ট হেতু এ তথ্য থেকেও মিলছে না। তৃতীয় একজন লেখক, ঌপ্র ত্মদজ্জ জ্মপ্রভন্ক্ষ-এর (৫০) বোম্বাই সংবাদদাতা বার্নার্ডের স্থলাভিষিক্ত জেনারেল রিডের অধীনে কত সৈন্য সমবেত হয়েছে তার একটা পরিষ্কার

তালিকা দিয়েছেন — এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় কেননা যে সব বিভিন্ন উপাদানে সৈন্য গঠিত তার আলাদা আলাদা হিসাব দিয়েছেন তিনি। তাঁর বিবৃতি অনুসারে, প্রায় ১,২০০ ইউরোপীয় ও ১,৬০০ শিখ, অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার ইত্যাদি, ধরা যাক প্রায় ৩,০০০ সৈন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চেম্বারলেনের নেতৃত্বে পঞ্জাব থেকে দিল্লির সম্মুখস্থ শিবিরে পৌঁছয় ২৩ জুন থেকে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে। অন্যদিকে, জেনারেল রিডের অধীনে এখন জমায়েত সমস্ত সৈন্যের হিসাব তিনি ধরছেন ৭,০০০, গোলন্দাজ ও দখলি ট্রেনও তার অন্তর্গত, তার ফলে পঞ্জাব থেকে বাড়তি শক্তি এসে পৌঁছবার আগে দিল্লি সৈন্যের সংখ্যা ৪,০০০ ছাড়াতে পারে না। ১৩ আগস্টের লন্ডন টাইমস বলে যে স্যার এইচ. বার্নার্ড ৭,০০০ ব্রিটিশ ও ৫,০০০ দেশীয়দের এক সৈন্যবাহিনী সমবেত করেছেন। এটা যদিও একটা বিষম অত্যুক্তি, তাহলেও বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তখন ইউরোপীয় শক্তি ছিল প্রায় ৪,০০০ সৈন্য, এবং তাদের পেছনে কিছুটা কমসংখ্যক দেশীয়। জেনারেল বার্নার্ডের অধীনস্থ আদি সৈন্যবাহিনীটা তাহলে জেনারেল রিডের অধীনে সম্প্রতি সমবেত সৈন্যবাহিনীটার সমানই ছিল। সুতরাং পঞ্জাব থেকে আসা নতুন শক্তিতে শুধু ক্ষয়ক্ষতিটাই পূরণ হয়েছে, অবরোধকারীদের সংখ্যা যাতে প্রায় অর্ধেকে দাঁড়িয়েছিল — এটা একটা প্রচণ্ড ক্ষতি, তা ঘটেছে অংশত বিদ্রোহীদের অবিরাম হামলায় ও অংশত কলেরার ধ্বংসলীলায়। এইভাবেই বোঝা যায়, ‘কার্যকরী আক্রমণের’ জন্য ব্রিটিশেরা কেন জোগাড় করতে পারে মাত্র ২,০০০ ইউরোপীয়।

দিল্লির সম্মুখে ব্রিটিশ সৈন্যদের সংখ্যা সম্পর্কে বলা গেল। এবার তাদের যুদ্ধকর্ম। তা যে খুব চমৎকার গোছের নয়, বেশ আন্দাজ করা যায় এই সহজ তথ্যটি থেকে যে, ৮ জুন জেনারেল বার্নার্ড যখন দিল্লির সামনেকার টিল দখল করার রিপোর্ট দেন তার পর হেডকোয়ার্টার্স থেকে কোনো রকম বুলেটিনই প্রকাশিত হয়নি। একটিমাত্র ব্যতিক্রম বাদে লড়াইগুলো সবই হয়েছে অবরুদ্ধদের হামলা যা প্রতিহত করেছে অবরোধকারীরা। অবরোধকারীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে কখনো সামনে কখনো পার্শ্বভাগে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ দিকের পশ্চাদভাগে। হামলা হয়েছে ২৭ ও ৩০ জুনে, ৩, ৪, ৯ ও ১৪ জুলাইয়ে। ২৭ জুন লড়াইটা ছিল বর্হিটির সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ, চলে কয়েক ঘণ্টা কিন্তু বিকালের দিকে ঋতুর প্রথম প্রবল বারিপাতে ব্যাহত হয়। ৩০ জুন অভ্যুত্থানীরা অবরোধকারীদের দক্ষিণ ভাগের ঘেরাওর মধ্যে সদলবলে দেখা দেয় ও তাদের পাহারা ও সহায়ক বাহিনীগুলিকে জ্বালাতন করে। ৩ জুলাই ভোরে অবরুদ্ধরা ইংরেজ ঘাঁটির দক্ষিণে পশ্চাদভাগে ফাঁকা আক্রমণ করে তারপর ছাউনির দিকে প্রেরিত রসদ ও ধনসম্পদের একটা কনভয় ট্রেন আটকারবার জন্য কর্নেল রোড দিয়ে চলে যায় পশ্চাদভাগে, একেবারে আলিপুর পর্যন্ত। যাবার পথে ২ নং পঞ্জাব অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটা বহির্ঘাঁটির সম্মুখীন হয় তারা ও তা সঙ্গে সঙ্গেই রণে ভঙ্গ দেয়। ৪ তারিখ শহরে ফেরার সময় বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে তাদের পথ আটকাবার জন্য ইংরেজ শিবির থেকে পাঠানো ১,০০০ পদাতিক ও দুই স্কোয়াড্রন ঘোড়সওয়ারের এক বাহিনী। বিদ্রোহীরা কিন্তু পিছু হটা সম্পূর্ণ করতে পারে অল্প ক্ষতি, অথবা মোটেই কোনো ক্ষতি না সয়ে এবং সমস্ত কামান বাঁচিয়ে। ৮ জুলাই ব্রিটিশ ছাউনি থেকে একটি সৈন্যদল পাঠানো হয় দিল্লি থেকে মাইল ছয়েক দূরে বুস্‌সি গ্রামের একটি খালে সাঁকো ধ্বংস করার জন্য, আগেকার হামলায় এই সাঁকো ব্যবহার করে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশের চূড়ান্ত পশ্চাদভাগ আক্রমণ করার এবং কর্নেল ও মিরাটের সঙ্গে ব্রিটিশ যোগাযোগে বাধা দেবার সুযোগ পায়। সাঁকোটি ধ্বংস করা হয়। ৯ জুলাই অভ্যুত্থানীরা ফের সদলবলে বেরিয়ে আসে ও ব্রিটিশ ঘাঁটির দক্ষিণ পশ্চাদভাগ আক্রমণ করে। সেই দিন তারযোগে লাহোরে পাঠানো সরকারি বিবরণে আক্রমণকারীদের ক্ষতির হিসাব দেওয়া হয়েছে — প্রায় ১ হাজার নিহত, কিন্তু এ হিসাব অতিশয় বাড়ানো বলে মনে হয়, কারণ শিবির থেকে ১৩ জুলাই তারিখের একটা চিঠিতে পড়ি :

‘আমাদের লোকেরা শত্রুপক্ষের আড়াই শত মৃতকে কবর দেয় ও পোড়ায় এবং বহু সংখ্যককে ওরাই সরিয়ে নিয়ে যায় শহরের মধ্যে।’

The Daily News-এ প্রকাশিত এই একই চিঠিতে এ ভান করা হয়নি যে ব্রিটিশেরা সিপাহীদের হটিয়ে দেয়, উল্টো বলা হয়েছে, ‘সিপাহীরা আমাদের সবকটি কর্মরত দলকে হটিয়ে দিয়ে তারপর

পশ্চাদপসরণ করে।' অবরোধকারীদের ক্ষতি হয় প্রভূত, তার পরিমাণ — দুই শ বারো হতাহত। ১৪ জুলাই আর একটা হামলার ফলে আর একটা প্রবল লড়াই হয়, তার বিশদ বিবরণ এখনো এসে পৌঁছয়নি।

ইতিমধ্যে অবরুদ্ধদের কাছে প্রবল বাড়তি শক্তি এসে পৌঁছেছে। বেরিলি, মোরাদাবাদ ও শাহজাহানপুর থেকে আগত রোহিলখণ্ড বিদ্রোহীরা ১ জুলাইয়ে তাদের দিল্লির সাথীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাতে পেরেছে — এদের মধ্যে আছে চার রেজিমেন্ট পদাতিক, এক রেজিমেন্ট অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার এবং একটি গোলন্দাজ ব্যাটারি।

লন্ডন টাইমস-এর বোম্বাই সংবাদদাতা বলেন, 'আশা করা হয়েছিল যে, তারা গঙ্গা পেরতে পারবে না, কিন্তু নদীর জল প্রত্যাশিত পরিমাণ বাড়েনি এবং গুরুমুখসেরের কাছে তারা তা পার হয়, দোয়াব পাড়ি দেয় ও দিল্লিতে পৌঁছয়। দুই দিন ধরে আমাদের সৈন্যেরা সখেদে দেখেছে সৈন্যসামন্ত, কামান, ঘোড়া ও সব ধরনের ভারবাহী পশুর (কারণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে ৫০,০০০ পাউন্ডের মতো একটা ধন ছিল) একটা লম্বা সারি নৌকার সেতু বাহিত হয়ে পৌঁছেছে শহরে, তা বন্ধ করার বা কোনো রকম বাধা দেবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।'

রোহিলখণ্ডের গোটা পথটা দিয়ে অভ্যুত্থানীদের এই সফল মার্চ প্রমাণ করে যে, রোহিলখণ্ডের পাহাড় পর্যন্ত যমুনার পূর্ব পারের সমস্ত এলাকাটা ইংরেজ সৈন্যের কাছে বন্ধ, আর নিমাচ থেকে আগ্রা পর্যন্ত অভ্যুত্থানীদের নির্বিঘ্ন মার্চটা যদি ইন্দোর ও মহাও-এ বিদ্রোহের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে তাহলে যমুনার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটার পক্ষেই সেই এক কথা। দিল্লি প্রসঙ্গে ইংরেজদের একমাত্র — বস্তুতপক্ষে একমাত্র — সফল যুদ্ধকর্ম হল দিল্লির উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এলাকাটাকে জেনারেল ভ্যান কোর্টল্যান্ডের পঞ্জাব শিখ সৈন্য দিয়ে শান্ত করা। লুধিয়ানা ও সিরসার মধ্যবর্তী গোটা এলাকাটায় তাঁকে প্রধানত দস্যু উপজাতিদের সম্মুখীন হতে হয়, একটা দুরন্ত ও বালুকাময় মরুভূমিতে ছড়ানো বিরল সব গ্রামের বাসিন্দা এরা। ১১ জুলাই তিনি সিরসা ছেড়ে ফতেহাবাদের দিকে যাত্রা করেছেন বলে কথিত, সেখান থেকে মার্চ করবেন হিসারে — এই ভাবে অবরোধকারী বাহিনীর পশ্চাদভাগের অঞ্চলটা উন্মুক্ত করে দেবেন।

দিল্লি ছাড়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির আরো তিনটি জায়গা — আগ্রা, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ — দেশীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রামের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগ্রার ব্যাপারটার এই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, এইখানেই প্রথম দেখা গেল একটা দূরের ইংরেজ সামরিক কেন্দ্র আক্রমণের জন্য বিদ্রোহীরা একটা সংকল্পিত অভিযানে যাত্রা করেছে প্রায় ৩০০ মাইল এলাকার ওপর দিয়ে। ৯প্র.=শ্ক্ষাস্কদ্গস্প্র (৫১) নামক আগ্রায় মুদ্রিত একটি পত্রিকার মতে নাসিরাবাদ ও নিমাচের সিপাহী রেজিমেন্ট, প্রায় দশ হাজার সৈন্য (ধরা যাক ৭,০০০ পদাতিক, ১,৫০০ ঘোড়সওয়ার ও ৮টি কামান) জুনের শেষাশেষি আগ্রার কাছে আসে, জুলাইয়ের প্রথম দিকে ছাউনি ফেলে আগ্রা থেকে ২০ মাইল দূরে সুসিয়া গ্রামের পেছনকার ডাঙ্গায় এবং ৪ জুলাই সম্ভবত শহর আক্রমণের আয়োজন করে। এই সংবাদ পেয়ে আগ্রার সম্মুখস্থ ক্যান্টনমেন্টের ইউরোপীয় অধিবাসীরা কেল্লায় আশ্রয় নেয়। আগ্রার কম্যান্ডার* প্রথমে কোটা বাহিনীর ঘোড়সওয়ার, পদাতিক ও গোলন্দাজদের পাঠায় শত্রুর বিরুদ্ধে আগুবাড় ঘাঁটি হিসাবে, কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেই এরা দলকে দল গিয়ে যোগ দেয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে। ৫ জুলাই আগ্রার দুর্গসৈন্যরা, তাদের মধ্যে ৩ নং বেঙ্গল ইউরোপীয় রেজিমেন্ট, একটি গোলন্দাজ ব্যাটারি এবং ইউরোপীয় স্বেচ্ছাবাহিনীর একটা কোর, বিদ্রোহীদের আক্রমণ করার জন্য মার্চ করে এবং গ্রাম থেকে তাদের পেছনকার ডাঙ্গায় তাড়িয়ে দেয় বলে শোনা যায়, কিন্তু স্পষ্টতই নিজেরাই আবার হটে আসে, এবং মোট ৫০০ সৈন্যের মধ্যে ৪৯ জন হত ও ৯২ জন আহত হবার পর, শত্রুর ঘোড়সওয়ারগুলোয় বিব্রত ও বিপন্ন হয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয় যে, ৯প্র.=শ্ক্ষাস্কদ্গস্প্র-এর উক্তি অনুসারে 'তাদের দিকে গুলিবর্ষণ করার মতো সময় ছিল না।' অর্থাৎ ইংরেজরা সোজাসুজি পলায়ন করে ও কেল্লায় আটকে রাখে নিজেদের আর সিপাহীরা আগ্রায় পৌঁছিয়ে ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সমস্ত বাড়ি ধ্বংস করে। পরের দিন ৬ জুলাই, দিল্লির পথে তারা ভরতপুরের দিকে যাত্রা করে। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়েছে এই যে, আগ্রা ও দিল্লির মধ্যে

ইংরেজদের যোগাযোগ লাইন কেটে ফেলেছে বিদ্রোহীরা এবং সম্ভবত মোগলদের প্রাচীন নগরের সামনে তারা দেখা দেবে।

গত ডাক থেকেই যা সুবিদিত, কানপুরে জেনারেল হুইলারের অধীনে প্রায় ২০০ ইউরোপীয়ের একটি বাহিনী, ৩২ নং পদাতিক বাহিনীর স্ত্রীপুত্র কন্যাগণসহ, একটা সুরক্ষিত জায়গায় আটকে ছিল এবং তাদের ঘেরাও করে বিথুরের নানা সাহেব পরিচালিত বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহী। ১৭ এবং ২৪ থেকে ২৮ জুনের মধ্যে কেল্লার ওপর নানা আক্রমণ হয়, শেষ আক্রমণটায় জেনারেল হুইলার পায়ে গুলি লেগে জখমের ফলে মারা যান। ২৮ জুন নানা সাহেব ইংরেজদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন। শর্ত থাকে তারা গঙ্গায় নৌকা করে এলাহাবাদে চলে যেতে পারবে। শর্ত মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু ইংরেজরা নদীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে নদীর ডান তীর থেকে কামান দাগা হয়। নৌকার যে লোকেরা অপর পারে পালাবার চেষ্টা করে তারা ধরা পড়ে ও একদল অশ্বারোহীর হাতে কাটা পড়ে। নারী ও শিশুদের বন্দী করা হয়। সাহায্যের জরুরী দাবি জানিয়ে কানপুর থেকে বার বার দূত গিয়েছিল এলাহাবাদে, তাই ১ জুলাই মেজর রেনোর অধীনে মাদ্রাজ ফিউজিলিয়ার ও শিখদের একটা বাহিনী যাত্রা করে কানপুরের দিকে। ফতেপুরের চার মাইলের মধ্যে ১৩ জুলাই ভোরে তাদের সঙ্গে যোগ দেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যাভলক, ইনি ৮৪ নং ও ৬৪ নং-এর প্রায় ১,৩০০ ইউরোপীয় সৈন্য, ১৩ নং অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার এবং অযোধ্যা অনিয়মিত বাহিনীর অবশিষ্টদের নিয়ে বারাণসী থেকে এলাহাবাদে পৌঁছন ৩ জুলাই, তারপর ফোর্সড মার্চে মেজর রেনোর অনুসরণ করেন। রেনোর সঙ্গে সংযোগের দিনটাতেই তাঁকে লড়াইয়ে নামতে হয় ফতেপুরের সামনে, নানা সাহেব সেখানে তাঁর দেশীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন। মরিয়া একটা লড়াইয়ের পর জেনারেল হ্যাভলক শত্রুর পার্শ্বভাগের দিকে একটা মহড়া নিয়ে ফতেপুর থেকে তাঁকে কানপুরের দিকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন, এবং ১৬ ও ১৬ জুলাই ফের কানপুরে তার সঙ্গে দুবার লড়তে হয়। শেষোক্ত তারিখেই কানপুর পুনর্দখল করে ইংরেজরা, নানা সাহেব পেছিয়ে যান বিথুরের দিকে — এটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত, কানপুর থেকে বারে মাইল দূরে এবং শোনা যায় বেশ সুরক্ষিত। ফতেপুরে অভিযান করার আগে নানা সাহেব বন্দী ইংরেজ নারী ও শিশুদের সবাইকে খুন করেন। কানপুর পুনর্দখল ইংরেজদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে গঙ্গা দিয়ে তাদের যোগাযোগের পথটা নিরাপদ হল।

অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌতে ব্রিটিশ রক্ষী সৈন্যরা প্রায় সেই বিপদের অবস্থায় পড়ে, যা কানপুরে তাদের সাথীদের পক্ষে অমন মারাত্মক হয় — কেল্লায় আটকানো, বিপুল সংখ্যক সৈন্য দিয়ে ঘেরাও, রসদের টানাটানি এবং নেতৃহীন। নায়ক স্যার এইচ. লরেন্স মারা যান ৪ জুলাই, ২ তারিখের একটা হামলায় পায়ে জখম হয়ে টিটেনাস হয় তাঁর। ১৮ ও ১৯ জুলাইয়েও লক্ষ্ণৌ আত্মরক্ষা করে থাকল। তার উদ্ধারের একমাত্র ভরসা ছিল কানপুর থেকে জেনারেল হ্যাভলকের সসৈন্যে এগিয়ে আসায়। কিন্তু পেছনে নানা সাহেবকে রেখে তিনি তা করতে সাহস করবেন কী না সেই হল প্রশ্ন। এতটুকু বিলম্ব হলে কিন্তু লক্ষ্ণৌর পক্ষে মারাত্মক হবেই, কারণ মরশুমী বর্ষায় অচিরেই ফিল্ড অপারেশন অসম্ভব হয়ে উঠবে।

এইসব ঘটনা বিচার করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য যে, বাংলার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ব্রিটিশ সৈন্য ক্রমশ এক বিপ্লবের সমুদ্রের মধ্যে যোগাযোগহীন শৈলশীর্ষে অবস্থিত কতকগুলি ছোটো ছোটো ঘাঁটিতে পর্যবসিত হতে চলেছে। আশেপাশের ভ্রাম্যমাণ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পুণ্যধাম বারাণসী পুনর্দখলের একটা অসফল চেষ্টা ছাড়া নিম্ন বঙ্গে কেবল আংশিক অবাধ্যতার ঘটনা ঘটেছে মির্জাপুর, দানাপুর ও পাটনায়। পঞ্জাবে বিদ্রোহ মনোভাব জোর করে দমিয়ে রাখা হয়েছে, শিয়ালকোটে একটা এবং ঝিলমে একটা বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং পেশোয়ারের অসন্তোষ সফলভাবে সংযত করা হয়েছে। জন অভ্যুত্থানের চেষ্টা আগেই হয়েছে গুজরাটে, সাতারার পান্ধারপুরে, নাগপুরে ও নাগপুর রাজ্যের সাগরে, নিজাম রাজ্যের হায়দরাবাদে এবং পরিশেষে মহীশূরের মতো দক্ষিণ অঞ্চলেও, ফলে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শান্তিটা মোটেই একেবারে পাকা বলে ভাবা চলে না।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১১৮ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

---

* জন কলিন — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

*ভারতে ব্রিটিশ আয়

এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এ খোঁজ নেবার ইচ্ছে হয়, ব্রিটিশ জাতি ও জনগণের কাছে তাদের ভারতীয় ডোমিনিয়নের আসল মূল্য কী? সরাসরিভাবে অর্থাৎ রাজকর রূপে, ভারতীয় আয় ব্যয়ের উদ্বৃত্ত রূপে কিছুই ব্রিটিশ কোষাগারে জমা পড়ে না। বিপরীত দিকে বাৎসরিক খরচাটাই অতি বৃহৎ। যখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাপকভাবে দেশ জয়ের ভূমিকা নেয় — আজ যার প্রায় শতাব্দী হতে চলল — সেই মুহূর্ত থেকে তাদের অর্থসঙ্গাতি মুশকিল অবস্থায় পড়ে এবং বার বার তাদের পার্লামেন্টের কাছে আবেদন করতে হয় শুধু বিজিত ভূখণ্ড ধরে রাখার কাজে সামরিক সাহায্যের জন্যই নয়, দেউলিয়া অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আর্থিক সাহায্যের জন্যও। সেইভাবে চলেছে বর্তমান এই মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সৈন্যের জন্য অতো বড়ো একটা দাবি করা হয়েছে ব্রিটিশ জাতির ওপর, এবং নিঃসন্দেহে যার পরেই আসবে টাকার অনুরূপ দাবি। এযাবৎ তার বিজয় অভিযান চালাতে গিয়ে এবং ঠাট গড়তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেনা হয়েছে ৫,০০,০০,০০০ পাউন্ড স্টার্লিঙের বেশি, আর ব্রিটিশ সরকার ব্যয় করেছে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য ছাড়াও ৩০ হাজার সৈন্যের এক স্থায়ী বাহিনীকে ভারতে পাঠানো, সেখানে রাখা ও সেখান থেকে নিয়ে আসার খরচা। এই যখন অবস্থা, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারত সাম্রাজ্য থেকে গ্রেট বৃটিনের যে সুবিধা সেটা কেবল ব্যক্তিগত কিছু ব্রিটিশ প্রজার মুনাফা ও উপকারেই সীমাবদ্ধ। সে মুনাফা ও উপকারের পরিমাণ যে বেশ, তা বলতেই হবে।

সর্বাগ্রে রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রায় ৩,০০০ স্টক হোল্ডার, সাম্প্রতিক সনদ অনুসারে (৫২) ষাট লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং পরিশোধিত মূলধনের ওপর এদের জন্য গ্যারান্টি করা আছে শতকরা সাড়ে দশ পাউন্ড স্টার্লিং বাৎসরিক ডিভিডেন্ট, বছরে যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৩০,০০০ পাউন্ড। ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকের শেয়ার হাতবদল করা যায়, তাই যারই স্টক কেনার টাকা আছে সেই স্টক হোল্ডার হতে পারে এবং বর্তমান সনদ বলে সে স্টকের প্রিমিয়ম হল ১২৫ থেকে ১৫০ শতকরা। ৫০০ পাউন্ডের একটা স্টক যার দাম ধরা যাক ৬,০০০ ডলার, তা থাকলে স্টক হোল্ডার স্বত্বাধিকারী সভায় বক্তৃতা দিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে হলে তাঁর থাকা চাই ১,০০০ পাউন্ডের স্টক। ৩,০০০ পাউন্ড স্টক হোল্ডারের আছে দুটি ভোট, ৬,০০০ পাউন্ড স্টক হোল্ডারের চারটি ভোট। স্বত্বাধিকারীদের অবশ্য অধিকার বিশেষ নেই, শুধু ডিরেক্টর বোর্ডের নির্বাচন ছাড়া — এ বোর্ডে তারা নির্বাচন করে ১২ জন ডিরেক্টর আর ক্রাউন নিযুক্ত করে ৬ জন, কিন্তু ক্রাউনের মনোনীত এ ব্যক্তিদের দশ বা তদূর্ধ্ব বৎসর ভারতে বাস করার গুণ থাকা চাই। প্রতি বছর ডিরেক্টরদের এক তৃতীয়াংশের পদ যায়, কিন্তু তারা পুনর্নির্বাচিত বা পুনর্নিযুক্ত হতে পারে। ডিরেক্টর হতে হলে ২,০০০ পাউন্ড স্টকের মালিক হওয়া চাই। ডিরেক্টরদের প্রত্যেকের বেতন হল ৫০০ পাউন্ড, সভাপতি ও সহসভাপতির বেতন দ্বিগুণ, কিন্তু এ পদলাভের প্রধান প্রেরণা হল বেসামরিক ও সামরিক সবরকম ভারতীয় অফিসার নিয়োগের মুরুব্বি হতে পারা — বোর্ড অব কন্ট্রোল অবশ্য এ মুরুব্বিয়ানায় বহুলাংশে ভাগ বসায় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলির ক্ষেত্রে প্রধানত তাদেরই একচেটিয়া। এ বোর্ডে ছয় জন সদস্য, সবাই প্রিভি কাউন্সিলর, এবং সাধারণত দু তিন জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, বোর্ড সভাপতি সর্বদাই তাই, আসলে তিনি হলেন ভারতের রাষ্ট্র সচিব।

এরপর হল এ মুরুব্বিয়ানার অনুগ্রহভাজনেরা — পাঁচ শ্রেণিতে তারা বিভক্ত — সিবিল, ক্লেরিকাল, মেডিকেল, সামরিক ও নৌবহরী। ভারতে, অন্তত সিবিল লাইনে চাকরি পেতে হলে তথাকার কথিত ভাষার কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার, এবং সিবিল সার্বিসের জন্য যুবক তৈরি করার একটি কলেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আছে হেলিবেরিতে। সামরিক সার্বিসের জন্য অনুরূপ একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে লন্ডনের কাছে অ্যাডিস্‌কোম্ব-এ, এইসব কলেজে ঢোকার ব্যাপারটা কোম্পানির ডিরেক্টরদের আনুকূল্যাধীনে ছিল, কিন্তু সনদের সাম্প্রতিক সংস্কারে প্রার্থীদের প্রকাশ্য পরীক্ষা মারৎত তা প্রতিযোগিতায় উন্মুক্ত হয়েছে। ভারসে পৌঁছে একজন সিবিলিয়ান পায় মাসে ১৫০ ডলার, তারপর এক বা একাধিক দেশীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পাশ করার পর (পৌঁছবার বারো বাসের মধ্যে তা হওয়া চাই) তাকে সার্বিসভুক্ত করা হয়। বছরে তখন তার প্রাপ্তি ২,৫০০ ডলার থেকে ৫০,০০০ ডলার পর্যন্ত। শেষোক্ত পরিমাণটা বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্যদের বেতন, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্যরা পান বছরে প্রায় ৩০,০০০ ডলার। কাউন্সিলের সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তি বছরে প্রায় ২৫,০০০ ডলারের বেশি বেতন পাবেন না এবং ২০,০০০ ডলার বা ততোধিক বেতনের চাকরির জন্য ভারতে বারো বছর বাস করা চাই। নয় বছর বাস করলে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ডলার বেতনের যোগ্যতা হয় এবং তিন বছর বাসে হয় ৭,০০০ থেকে ১৫,০০০ ডলার বেতনের যোগ্যতা। সিবিল সার্বিসের চাকুরি বাহ্যত কর্মকাল ও যোগ্যতা অনুসারে, কিন্তু আসলে অনেকখানিই চলে আনুকূল্যলাভের ওপর। সিবিল সার্বিসের বেতন সবচেয়ে ভালো বলে তার জন্য প্রচুর কাড়াকাড়ি চলে, সে উদ্দেশ্যে সুযোগ পেলেই সামরিক অফিসাররা তাদের রেজিমেন্ট ছেড়ে আসে। সিবিল সার্বিসের সমস্ত বেতনের গড় ৮,০০০ ডলার বলে কথিত, কিন্তু তার মধ্যে পূর্ব-প্রয়োজন ও অতিরিক্ত ভাতাদি ধরা হয় না, যার পরিমাণ প্রায়ই বেশ বৃহৎ। এই সিবিল সার্বেন্টরা নিযুক্ত হন লাট, কাউন্সিলর, জজ, রাষ্ট্রদূত, সেক্রেটারি, রেভেন্যু কলেক্টর ইত্যাদি পদে — সমগ্রভাবে সংখ্যাটা সাধারণত ৮০০-র মতো। ভারতের বড়োলাটের বেতন ১,২৫,০০০ ডলার, কিন্তু বাড়তি ভাতার পরিমাণ প্রায়ই তারো বেশি। চার্চ সার্বিসে আছে তিন জন বিশপ ও প্রায় ১৬০ জন চ্যাপলেন। কলকাতার বিশপ পান বছরে ২৫,০০০ ডলার, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বিশপ তার অর্ধেক, চ্যাপলেনরা পায় তাদের ফি ছাড়া ২,৫০০ থেকে ৭,০০০ ডলার। মেডিকেল সার্বিসে আছে শ আটেক চিকিৎসক ও অস্ত্রচিকিৎসক, বেতন ১,৫০০ থেকে ১০,০০০ ডলার।

পরাধীন রাজারা যেসব বাহিনীর ভরণপোষণ করতে বাধ্য হয় তা সমেত ভারতে নিযুক্ত ইউরোপীয় সামরিক অফিসারদের সংখ্যা হাজার আটেক। পদাতিক বাহিনীতে নির্দিষ্ট বেতন হল : এনসাইনদের জন্য ১,০৮০ ডলার, লেফটন্যান্টদের ১,৩৪৪, ক্যাপ্টেনদের ২,২২৬, মেজরদের ৩,৮১০, লেফটন্যান্ট-কর্ণেলদের ৫,৫২০ ও কর্ণেলদের ৭,৬৮০ ডলার। এ হল সৈন্যাবাসে থাকাকালীন বেতন। সক্রিয় সার্বিসে এ বেতন আরো বেশি। অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়র বাহিনীতে বেতন কিছুটা উঁচু। স্টাফের কাজ বা সিবিল সার্বিসের কোনো পদ নিয়ে বহু অফিসার তাদের বেতন দ্বিগুণ করে নেয়।

এই হল প্রায় হাজার দশেক ব্রিটিশ প্রজা যারা ভারতে শাঁসালো পদে অধিষ্ঠিত এবং ভারতীয় সার্বিস থেকে যারা বেতন পায়। এর সঙ্গে যোগ করা উচিত ইংলন্ডবাসী একটা বড়ো সংখ্যা — নির্দিষ্ট পরিমাণ বৎসর কাজ করার পর প্রত্যেক সার্বিসেই পেনসন দেওয়া হয় এবং এরা পেনসন নিয়ে ইংলন্ডে বাস করছে। এই পেনসন এবং ডিভিডেন্ট ও দেনার জন্য ইংলন্ডে প্রদেয় সুদ বাবদ বছরে ভারত থেকে যায় দেড় দুই কোটি ডলার — কার্যত এটাকে ধরা যেতে পারে অপ্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের মারফত ইংলন্ড সরকারের নিকট অতিরিক্ত রাজকর। বিভিন্ন সার্বিস থেকে যারা অবসর নেয় তারা প্রতি বছর তাদের বেতন থেকে প্রভূত পরিমাণ সঞ্চয় সঙ্গে নিয়ে যায়, ভারতের বাৎসরিক নিঃসরণের ওপর এটা হল বাড়তি।

সরকারি সার্বিসে প্রত্যক্ষত নিযুক্ত এইসব ইউরোপীয় ছাড়াও ভারতে ৬,০০০ কি তারো বেশি ইউরোপীয় বাস করে, যারা বাণিজ্য বা ব্যক্তিগত ফাটকায় নিযুক্ত। গ্রামাঞ্চলের কিছু আখ, কফি ও নীলকর ছাড়া তারা হল কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও তাদের লাগোয়া অঞ্চলের বাসিন্দা, প্রধানত বণিক, এজেন্ট ও

কারখানা মালিক। আমদানি রপ্তানির প্রতিক্ষেত্রে প্রায় ৫ কোটি ডলার মূল্যের ভারতের সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্যই প্রায় সবটা এদের হাতে এবং তাদের মুনাফা নিঃসন্দেহেই বেশ বড়ো।

এ থেকে বোঝা যায় যে ভারতের সঙ্গে ইংলন্ডীয় সম্পর্কের ফলে ব্যক্তিগতভাবে লোকেদের অনেক লাভ এবং অবশ্যই সে লাভটায় মোট জাতীয় সম্পদই বাড়ে। কিন্তু তার উল্টোদিকে একটা অতি বড়ো বরাদ্দ ধরতে হবে। ভারত ডোমিনিয়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডবাসীর পকেট থেকে দেওয়া সামরিক ও নৌবাহিনীর খরচা ক্রমাগত বেড়েছে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে ব্রহ্ম, আফগান, চিন ও পারস্য যুদ্ধের খরচ। বস্তুতপক্ষে, বিগত রুশ যুদ্ধের গোটা খরচাটাও ভারত বাবদে ধরা উচিত, কেননা যে রুশাতঙ্ক ও রুশাশঙ্কা থেকে সে যুদ্ধের শুরু, তা সম্পূর্ণই ভারতে রাশিয়ার অভিসন্ধি জনিত ঈর্ষা থেকে। এর সঙ্গে, ভারত দখলে রাখার ফলে ইংরেজরা যে অশেষ জয়াভিযান ও নিরন্তর আক্রমণের মধ্যে জড়িত হচ্ছে তা যোগ করলে রীতিমতো সন্দেহ হয় যে, মোটের ওপর ও ডোমিয়িন থেকে আদৌ যতটা মুনাফা তোলার আশা আছে, ঠিক ততটাই খরচা হবার আশঙ্কা থাকছে কিনা।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
জ্বপ্রন্ড্ল-=ক্র ত্মদজ্জ ৯ট্রঁপ্র পত্রিকার ৫১২৩ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

কার্ল মার্কস
ভারতে অভ্যুত্থান

লন্ডন, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭

ভারতে বিদ্রোহী সিপাহীরা যে অত্যাচার করেছে তা বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর, বীভৎস, অবর্ণনীয় — যা কেবল অভ্যুত্থানী যুদ্ধে, জাতিযুদ্ধে, বর্ণযুদ্ধে ও সর্বোপরি ধর্মযুদ্ধেই দেখার জন্য তৈরি থাকতে হয়, এক কথায়, তেমনি অত্যাচার, শালীন ইংলন্ড যার তারিফ করেছে যখন তা ভেঁদীয়রা চালিয়েছে 'ব্লু'দের ওপর, স্পেনীয় গেরিলারা চালিয়েচে নাস্তিক ফরাসিদের ওপর, সার্বীয়রা চালিয়েছে তাদের জার্মান ও হাঙ্গেরির প্রতিবেশিদের ওপর, ক্রোশীয়রা চালিয়েছে ভিয়েনার বিদ্রোহীদের ওপর, কাভেনিয়াক-এর গার্ড মোবিল বা বোনাপার্টের ডিসেম্ব্রিস্টরা চালিয়েছে ফ্রান্সের প্রলেতারিয় ছেলেমেয়েদের ওপর (৫৩)। সিপাহীদের আচরণ যতই নিন্দনীয় হোক তা শুধু ইংলন্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর্বেই নয়, গত দশ বছরের দীর্ঘস্থাপিত শাসনেও ইংলন্ড নিজে যা আচরণ করেছে তারই একটা পুঞ্জিভূত প্রতিফলন। এ শাসনের চরিত্র নির্ণয় করতে হলে এই বললেই হবে যে তার আর্থিক কর্মনীতির অঙ্গাঙ্গি ব্যবস্থা হল জুলুম*। মানব ইতিহাসে প্রতিশোধ বলে একটা কথা আছে, আর ঐতিহাসিক প্রতিশোধের নিয়মই হল যে তার অস্ত্র গড়ে দেয় পীড়িত নয়, পীড়ক স্বয়ং।

ফরাসি রাজতন্ত্রের ওপর প্রথম আঘাত এসেচিল চাষিদের কাছ থেকে নয়, অভিজাতদের কাছ থেকে। ব্রিটিশের হাতে নিপীড়িত, অবমানিত ও বিবস্ত্র রায়তদের মধ্য থেকে ভারতীয় বিদ্রোহ শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে ব্রিটিশদের হাতে খাওয়া, পরা, পিঠচাপড়ানি, পুষ্টি ও াাবদার পাওয়া সিপাহীদের কাছ থেকে। সিপাহী নৃশংসতার তুলনা দিতে হলে কিচু লন্ডন সংবাদপত্র যা ভান করছে সেভাবে মধ্যযুগ খুঁজে দেখার দরকার নেই, সমসাময়িক ইংলন্ডীয় ইতিহাসের বাইরে পা দেবারও প্রয়োজন হবে না। শুধু প্রথম চিন যুদ্ধটা (৫৪) বিচার করলেই হবে — এ ঘটনা তো বলা যেতে পারে গতকালের। ইংরেজ সৈন্য তখন যেসব জঘন্য কাজ করেছে তা নিতান্ত মজা দেখার জন্য — তাদের এ রোষের পেছনে ছিল না কোনো ধর্মীয় উন্মাদনার শুদ্ধি, ছিল না অভিযানকারী জুলুমবাজ এক জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রকোপ, না ছিল বীরোচিত এক শত্রুর কঠোর

প্রতিরোধ-জনিত প্ররোচনা। নারীর ধর্ষণ, শিশুদের বেঅনেটে গাঁথা, গ্রামকে গ্রাম অগ্নিপক্ক করে তোলা, এ সব বেয়াড়া খেলার কথা লিখে গেচে মান্দারিনরা নয়, খোদ ব্রিটিশ অফিসাররাই।

বর্তমান বিপর্যয়েও নিদারুণ ভুল হবে যদি ভাবি যে, নিষ্ঠুরতা সবকিছুই সিপাহীদের তরফে আর ইংরেজদের তরফে শুধুই মানবিক দয়ার পয়ঃপ্রবাহ। ব্রিটিশ অফিসারদের চিঠিগুলি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। পেশোয়ার থেকে লেখা এক অফিসারের চিঠিতে বর্ণনা করা হয়েছে ৫৫ নং দেশীয় পদাতিকদের আক্রমণ করার হুকুম সত্ত্বেও আক্রমণ না করায় ১০ নং অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে কী ভাবে নিরস্ত্র করা হয়। এই ঘটনায় তাঁর ভারি আহ্লাদ যে, তাদের শুধু নিরস্ত্রই করা হয়নি, কোট ও বুটও খুলে নেওয়া হয়, তারপর মাথা পিছু ১২ পেঃ করে দিয়ে তাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নদীতীরে, সেখানে নৌকোয় তুলে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয় সিন্ধুর স্রোতে, যেখানে নদীর খরস্রোতে প্রতিটি মাতৃসন্তানেরই ডুবে মরার প্রত্যাশায় লেখক আনন্দিত। আর একজন লেখক জানাচ্ছেন যে পেশোয়ারের কিছু অধিবাসী বিবাহ উপলক্ষে বারুদের বোম পটকা ফাটিয়ে (জাতীয় প্রথা) নৈশ হুঁশিয়ারির সৃষ্টি করায় সংশ্লিষ্ট লোকদের পরদিনই বেঁধে এনে 'এমন চাবকানো হয় যে তারা সহজে ভুলবে না।' পিণ্ডি থেকে খবর আসে যে তিন জন দেশীয় সর্দার চক্রান্ত করছে। স্যার জন লরেন্স জবাবে এক বার্তা প্রেরণ করে বলেন, একটি গোয়েন্দা যেন বৈঠকে হাজির থাকে। গোয়েন্দার রিপোর্ট পেয়ে স্যার জন দ্বিতীয় বার্তা পাঠান, 'ফাঁসি দিয়ে দাও!' সর্দারদের ফাঁসি হয়। এলাহাবাদ থেকে সিবিল সার্বিসের একজন অফিসার লিখছেন, 'দণ্ডমুণ্ডের ক্ষমতা আছে আমাদের হাতে, এবং নিশ্চিত থাকুন যে আমরা ছেড়ে কথা কইছি না।' ওইখান থেকেই আর একজন, 'ওদের (সৈনিক নয়) দশ পনের জন করে ঝুলাচ্ছি না, এমন একটা দিনও যায় না।' একজন অফিসার আহ্লাদ করে লিখছেন, 'দলে দলে ওদের ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছে হোম্‌স্ — 'দয়াবতারের' মতো।' বড়ো একদল দেশীয়কে সরাসরি ফাঁসি দেওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে আরেকজন, 'তখন শুরু হল আমাদের মজা।' তৃতীয় একজন, 'ঘোড়ায় চেপেই আমরা কোর্ট-মার্শাল চালাই আর 'কালা'দের দেখলেই আমরা হয় ঝুলিয়ে দিই, নয় গুলি করি।' বারাণসী থেকে জানানো হচ্ছে যে দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতির সন্দেহেই তিরিশ জন জমিদারকে ফাঁসি দেওয়া হয় ও একই অজুহাতে পোড়ানো হয় গ্রামকে গ্রাম। বারাণসী থেকে জনৈক অফিসারের চিঠি ছাপা হয়েছে ৢ=ঁ=ঁ ঌঁপ্রস্ক-এ, তিনি বলছেন, 'দেশীয়দের মোকাবেলায় ইউরোপীয় সৈন্যরা পিশাচ হয়ে উঠেছে।'

তদুপরি ভোলা উচিত নয় যে ইংরেজদের নিষ্ঠুরতাকে যে ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয় সামরিক তেজের একটা ঘটনা হিসাবে, বলা হয় সহজে, চটপট করে, বীভৎস খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে, সে ক্ষেত্রে দেশীয়দের জুলুম রোমহর্ষক হলেও তাকে ইচ্ছে করে আরো অতিরঞ্জিত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দিল্লি ও মিরাটে অনুষ্ঠিত নৃশংসতার বিশদ বিবরণ যা প্রথমে The Times-এ ছাপা হয়, তারপর গোটা লন্ডন প্রেসে ঘুরছে, তা এসেছে কার কাছ থেকে? মহীশূরের বাঙ্গালোর-বাসী এক ভীরু পাদরির কাছ থেকে, জায়গাটা ঘটনাস্থল থেসক সরাসরি হাজার মাইলেরও বেশি দূরে। দিল্লির আল ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু বিদ্রোহীর দুরন্ত খেয়ালের চেয়েও বেশি ভয়াবহতা সৃষ্টি করতে এক ইংরেজ পাদরি সমর্থ। ম্যাঞ্চেস্টার শান্তি সমিতির সম্পাদক* কর্তৃক ক্যান্টন বাসগৃহগুলির উপর তপ্তলাল গোলা দাগা, বা জনৈক ফরাসি মার্শাল কর্তৃক গুহাশ্রয়ী আরবদের অগ্নিসিদ্ধ করা (৫৫) অথবা মুষল-মস্তক কোর্ট-মার্শালের নব-পুচ্ছ বেতে ব্রিটিশ সৈন্যদের জীবন্ত চামড়া তুলে নেওয়া অথবা ব্রিটিশের প্রায়শ্চিত্ত বন্দিবাসে অন্য যেসব মানবদরদী ব্যবস্থা আছে, তার চেয়ে নাক স্তন ইত্যাদি কাটা অর্থাৎ সিপাহীদের অনুষ্ঠিত অঙ্গচ্ছেদের ভয়াবহ ঘটনা অবশ্যই ইউরোপীয় মনের কাছে বেশি বদলায়। বিদগ্ধ পণ্ডিত সিজার সরল মনেই বর্ণনা করেছেন কী ভাবে তিনি সহস্র গল যোদ্ধার ডান হাত কেটে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন (৫৬)। এ কাজ করতে লজ্জা বোধ হত নেপোলিয়নের। তার বদলে তিনি রিপাবলিকানিজম্-এর সন্দেহে তাঁর নিজস্ব ফরাসি রেজিমেন্টদের চালান দিয়েছিলেন সান্তো-দোমিঙ্গোতে, কালাদের ও প্লেগের কবলে মরতে।

সিপাহীদের অনুষ্ঠিত জঘন্য অঙ্গচ্ছেদ শুনে মনে হবে খ্রিস্টিয় বাইজানটিয়ান সাম্রাজ্যের প্রথার কথা, অথবা সম্রাট পঞ্চম চার্লসের (৫৭) ফৌজদারি বিধির কথা, কিংবা দেশদ্রোহের জন্য ইংরেজি শাস্তির কথা যা

লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন বিচারক ব্ল্যাকস্টোন (৫৮)। ধর্ম হিন্দুদের করে তুলেছে আত্মনিপীড়নে ওস্তাদ, তাদের জাতি-ধর্মের শত্রুদের ওপর এই নির্যাতন তাই তাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক, এবং তা আরো স্বাভাবিক ঠেকা উচিত ইংরেজদের কাছে, যারা মাত্র কয়েক বছর আগেও এক নিষ্ঠুর ধর্মের রক্তাক্ত পূজা রক্ষা করে ও তাতে সহায়তা করে আয় করত জগন্নাথ উৎসব থেকে।

কবেট যা বলতেন, সেই 'ধাড়ী রক্তাক্ত ৯প্র ৯ঁপ্রন্ধ-এর' উন্মত্ত গর্জন, মোজার্টের অপেরার সেই এক ক্রুদ্ধ চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ, যে তার শত্রুকে প্রথমে ফাঁসি পরে অগ্নিদগ্ধ তারপর চতুষ্খণ্ড করে অতঃপর বেঅনেটে গেঁথে ও পরে জীবন্তই ছাল ছাড়িয়ে নেবার কল্পনায় অতি সুরেলা ঝঙ্কারে গান ধরে (৫৯) — প্রতিশোধের কামনায় এই মাথা কোটা — এ সবই নিতান্ত নির্বোধ বলে মনে হত যদি ট্রাজেডির বিষাদের আড়ালে পরিষ্কার না ফুটে উঠত কমেডির চালাকি। ৯প্র্ল=ঁ=ঁ ৯ঁপ্রন্ধ তার ভূমিকার অতিঅভিনয় যে করছে সেটা কেবল আতঙ্কে নয়। প্রতিশোধের তারতুফ তেমন একটা বিষয়বস্তু দান করেছে কমেডিতে, মলিয়ের পর্যন্ত যার খোঁজ পাননি। এ শুধু চায় ফন্ডের গুণ গেয়ে সরকারকে আড়াল করতে। জেরিকোর প্রাচীরের (৬০) মতো দিল্লির প্রাচীর যেহেতু কেবল বাতাসের ঝাপটায় ভেঙে পড়েনি, তাই আকর্ণব্যাদান প্রতিশোধের চিৎকারে আচ্ছন্ন করতে হবে জন বুলকে, যাতে সে ভুলে যায় যে অনিষ্টটা পাকিয়ে তোলা ও বিপুল আয়তনে পৌঁছতে দেবার জন্য তারই সরকার দায়ী।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১১৯ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত

* এই সংকলনের ৭৩-৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য — সম্পাঃ।
* জন বাউরিং — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

*ভারতে অভ্যুত্থান

ভারত থেকে যে সংবাদ গতকাল আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার মধ্যে ইংরেজদের পক্ষে একটা ভারি বিপর্যয়কর ও আশঙ্কার দিক আছে, যদিও অন্য স্তম্ভ থেকে দেখা যাবে, আমাদের বুদ্ধিমান লন্ডন সংবাদদাতা সেটিকে অন্যভাবে দেখছেন (৬১)। দিল্লি থেকে ২৯ জুলাইয়ের বিশদ বিবরণ এবং পরে এই মর্মে একটি রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে, কলেরার ধ্বংসলীলায় অবরোধকারী সৈন্যরা দিল্লির সামনে থেকে সরে গিয়ে আগ্রায় ডেরা নিতে বাধ্য হয়েছে। লন্ডনের কোনো পত্রিকাই এ রিপোর্ট স্বীকার করেনি তা সত্য, কিন্তু আমরা বড়ো জোর এটিকে কিছুটা অকালপ্রসূত বলে ভাবতে পারি। সমস্ত ভারতীয় সংবাদ থেকে আমরা জানি যে, অবরোধকারী সৈন্যবাহিনী ১৪, ১৮ ও ২৩ জুলাইয়ের হামলায় গুরুতর ভুগেছে। এই দিনগুলোয় বিদ্রোহীরা আগের চেয়ে অনেক বেপরোয়া প্রচণ্ডতায় লড়েছে এবং তাদের কামানের উৎকর্ষের ফলে লড়েছে অতি সুবিধা নিয়ে।

একজন ব্রিটিশ অফিসার লিখছেন, 'আমরা দাগছি ১৮ পাউন্ডি কামান আর ৮ ইঞ্চি হাউইৎসার অথচ বিদ্রোহীরা জবাব দিচ্ছে চব্বিশ ও বত্রিশে।' আর একজন বলছেন, 'যে আঠারোটা হামলা আমাদের রুখতে হয়েছে তাতে হতাহতে এক তৃতীয়াংশ সংখ্যা আমরা হারিয়েছি।'

অতিরিক্ত সৈন্য যোজনের যেটুকু আশা করা যায় তা হল জেনারেল ভ্যান কোর্টল্যান্ডের অধীনে একদল শিখ। কয়েকটি সফল লড়াইয়ের পর জেনারেল হ্যাভলক কানপুরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, লক্ষ্ণৌ ত্রানের কাজটা আপাতত স্থগিত রেখেছেন। সেই সঙ্গে 'দিল্লির সামনে প্রবল বর্ষা শুরু হয়েছে', ফলে কলেরার

তীব্রতাও অবশ্যই বেড়েছে। তাই যে ডিসপ্যাচে আগ্রায় পশ্চাদপসরণ ও অন্তত সাময়িকভাবে মহা মোগলদের রাজধানী করতলগত করার প্রচেষ্টা ত্যাগের কথা বলা হয়েছে সেটা ইতিমধ্যেই সত্যি না হলে অচিরেই সত্যি হওয়ার কথা।

গঙ্গার পথে জেনারেল হ্যাভলকের যুদ্ধক্রিয়াটাই প্রধান আগ্রহের বস্তু, ফতেপুর, কানপুর ও বিথুরে তাঁর যে কীর্তি সেটা স্বভাবতই আমাদের লন্ডন সহযোগীরা বেশ ফলাও করেই প্রশংসা করেছেন। আগেই বলেছি, কানপুর থেকে ২৫ মাইল এগিয়ে যাবার পর তিনি শুধু অসুস্থদের জমা দেবার জন্যেই নয়, নতুন সৈন্য জোগানের অপেক্ষা করার জন্যেও সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে বাধ্য হন। সেটা খুব আফশোষের কথা, কারণ এতে বোঝা যাচ্ছে যে, লক্ষ্নৌ উধারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানকার ব্রিটিশ রক্ষী সৈন্যদের এখন একমাত্র আশা ৩,০০০ গুর্খার একটা সৈন্যদল, তা তাদের সাহায্যের জন্য জঙ্গা বাহাদুর পাঠিয়েছেন নেপাল থেকে। তারা যদি অবরোধ তুলতে না পারে তাহলে কানপুর হত্যাকাণ্ডের পুনরনুষ্ঠান হবে লক্ষ্মীতে। তাই সব নয়। বিদ্রোহীগণ কর্তৃক লক্ষ্নৌ কেল্লা দখল ও তদনুসারে অযোধ্যায় তাদের শক্তি সংহতির ফলে দিল্লির বিরুদ্ধে সমস্ত ব্রিটিশ যুদ্ধক্রিয়া পার্শ্বভাগ থেকে বিপন্ন হবে এবং বারাণসীতে ও সমগ্র বিহার জেলায় বিপক্ষ শক্তিগুলির ভারসাম্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। লক্ষ্নৌর কেল্লা বিদ্রোহীরা দখল করে থাকায় কানপুরের গুরুত্ব অর্ধেক কমে যাবে এবং একদিকে দিল্লির সঙ্গে এবং অন্যদিকে বারাণসীর সঙ্গে তার যোগাযোগ বিপন্ন হবে। এ অঞ্চল থেকে সংবাদের জন্য যে কষ্টকর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতে হচ্ছে তা এই ঘটনায় বাড়ছে। ১৬ জুন রক্ষিসৈন্যদল হিসেব করেছিল দুর্ভিক্ষ বরাদ্দে তারা টিকে থাকতে পারে ছয় সপ্তাহ। ডিসপ্যাচের সর্বশেষ তারিখটা নাগাদ তার পাঁচ সপ্তাহ ইতিমধ্যেই কেটে গেছে। ওখানে সবকিছুই এখন নির্ভর করছে নেপাল থেকে আসা সৈন্যদের ওপর, যার কথা শোনা গেছে কিন্তু এখনো নিশ্চিত নয়।

গঙ্গার ভাঁটির দিকে, কানপুর থেকে বারাণসী ও বিহার জেলার দিকে এগুলে ব্রিটিশদের ভবিষ্যত আরো অন্ধকার। The Bengal Gazette (৬২), বারাণসী ৩ আগস্ট, একটা চিঠি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে যে,

‘দানাপুর থেকে বিদ্রোহীরা শোন পার হয়ে আরার দিকে মার্চ করেছে। ইউরোপীয় অধিবাসীরা ন্যায়তই তাদের নিরাপত্তায় শঙ্কিত হয়ে সৈন্য প্রেরণের জন্য দানাপুরে লেখে। সেই হিসাবে মহারানির ৫ নং, ১০ নং ও ৩৭ নং রেজিমেন্ট থেকে কিছু ডিট্যাচমেন্ট নিয়ে দুটি স্টমার পাঠান হয়। মাঝরাত্রে একটি স্টিমার কাদায় আটকে যায়, তাকে নড়ানো যায় না। সৈন্যদের তাড়াতাড়ি করে নামিয়ে হাঁটিয়ে যাত্রা করানো হয়, কিন্তু কোনো সতর্কতা অবলম্বন না করে। হঠাৎ দুই দিকে তদের ওপর খুব কাছাকাছি থেকে তুমুল অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়, এবং কয়েকজন অফিসার সহ ছোট্ট দলটার ১৫০ ু=ত্রহ্ম প্র৬ল্পঁস্র। স্টেশনের সমস্ত ইউরোপীয়কে, সংখ্যায় প্রায় ৪৭ জন, হত্যা করা হয়েছে বলে ধরা হচ্ছে।’

বাংলা প্রেসিডেন্সির শাহাবাদ নামক ব্রিটিশ জেলার একটি শহর আরা হল দানাপুর-গাজীপুর রাস্তা ওপরে, দানাপুরের পঁচিশ মাইল পশ্চিমে এবং গাজীপুরের পঁচাত্তর মাইল পূর্বে। খাস বারাণসীও বিপন্ন। এখানে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে নির্মিত একটি কেল্লা আছে এবং বিদ্রোহীদের হাতে পড়লে তা আর একটা দিল্লি হয়ে উঠবে। বারাণসীর দক্ষিণে এবং গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত মির্জাপুরে একটি মুসলমান ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে, আর কলকাতা থেকে মাইল আশী দূরে গঙ্গাতীরস্থ বহরমপুরে নিরস্ত্র করা হয়েছে ৬৩ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে। সংক্ষেপে, একপক্ষে অসন্তোষ এবং অন্যপক্ষে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে গোটা বাংলা প্রেসিডেন্সি জুড়ে, এমন কি কলকাতার দরজা পর্যন্ত, — সেখানে মহরমের মহা উপবাস নিয়ে অতি দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ইসলাম-অনুগামীরা সে সময় একটা ধর্মান্ধ উত্তেজনায় তরোয়াল হাতে বেরিয়ে পড়ে, এতটুকু প্ররোচনাতেই লড়তে এগোয়, এ মহরম ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ আক্রমণে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা, সেখানে খোদ গভর্নর-জেনারেল** তাঁর নিজের বডিগার্ডদের নিরস্ত্র করতে বাধ্য হন। পাঠকেরা তাই বুঝতে পারছেন যে, যোগাযোগের প্রধান পথ — গঙ্গা পথটা ব্যাহত, কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন হবার বিপদ রয়েছে। যে সৈন্যদলের নভেম্বরে আসার কথা তাদের অগ্রগতি এতে প্রভাবিত হবে এবং যমুনায় ব্রিটিশ যুদ্ধলাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও ব্যাপার অতি গুরুতর হয়ে উঠছে। কালাপুরে ২৭ নং বোম্বাই দেশীয় পদাতিক বাহিনীর বিদ্রোহা একটা ঘটনা, কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে তাদের পরাজয়টা গুজব মাত্র। বোম্বাই দেশীয় সৈন্যবাহিনী পরপর নাগপুর, ঔরঙ্গাবাদ, হায়দরাবাদ এবং পরিশেষে কোলাপুরে বিদ্রোহ করেছে। বোম্বাই দেশীয় নৈস্যবাহিনীর আসল সংখ্যা ৪৩,০৪৮ জন, আর এ প্রেসিডেন্সিতে আসলে আছে মাত্র দুটি ইউরোপীয় রেজিমেন্ট। শুধু বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেই নয়, পঞ্জাবের সিন্ধু পর্যন্ত অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ, মহাও ও ইন্দোরে প্রেরণের জন্য বাহিনী গঠন, এ জায়গাগুলির পুনরুদ্ধার ও রক্ষণ, আগ্রার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও সেখানকার দুর্গসৈন্যদের সাহায্যদানেও ভরসা করা হয়েছে দেশীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর। এ কাজের জন্য ভার দেওয়া হয় ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্টের যে বাহিনীর ওপর, তাতে ছিল ৩ নং বোম্বাই ইউরোপীয় রেজিমেন্টের ৩০০ সৈন্য, ৫ নং বোম্বাই দেশীয় পদাতিকের ১,০০০ সৈন্য, ১৯ নং বোম্বাই দেশীয় পদাতিকের ২০০ সৈন্য এবং হায়দরাবাদ কন্টিনজেন্টের ৩ বং ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্টের ৮০০ সৈন্য। ২,২৫০ জন দেশীয় সৈন্যের এই বাহিনীর সঙ্গে আছে প্রায় ৭০০ ইউরোপীয়, প্রধানত মহারানির ৮৬ নং পদাতিক ও ১৪ নং লাইট ড্র্যাগুন থেকে। তাছাড়াও ইংরেজরা ঔরঙ্গাবাদে দেশীয় সৈন্যদের একটি বাহিনী জমায়েত করেছে, তার লক্ষ্য হল খান্দেশ ও নাগপুরের অসন্তুষ্ট এলাকাগুলিকে ভয় দেখনো ও সেই সঙ্গে মধ্য ভারতে সক্রিয় ভ্রাম্যমাণ দলগুলিকে সহায়তা করা।

বলা হয়েছে, ভারতের ওই অঞ্চলে ‘শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছে’, কিন্তু এতে পুরোপুরি ভরসা করতে পারি না। বস্তুত, মহাও দখল করার ওপর নয়, দুই মারাঠা রাজা হোলকার ও সিন্ধিয়া কী পথ নেয় তার ওপরেই এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত। যে ডিসপ্যাচে মহাও-তে স্টুয়র্টের আগমনের কথা জানানো হয়, তাতেই বলা হয়েছে যে, হোলকার এখনো অটল থাকলেও তাঁর সৈন্যরা বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। আর সিন্ধিয়ার কর্মনীতি সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয়নি। ইনি যুবক, জনপ্রিয়, তেজী, সমস্ত মারাঠা জাতির স্বাভাবিক নেতা ও সমাবেশ কেন্দ্র বলে তাঁকে ধরা হবে। তাঁর নিজের ১০,০০০ সুশৃঙ্খল সৈন্য আছে। তিনি ব্রিটিশদের পক্ষ ত্যাগ করলে শুধু মধ্য ভারত তাদের হাতছাড়া হবে তাই নয়, বিপ্লবী সঙ্ঘটা পাবে বিপুল শক্তি ও সঙ্গতি। দিল্লির সম্মুখস্থ সৈন্যদলের পশ্চাদপসরণ, অসন্তুষ্টদের হুমকি ও মিনতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত দেশবাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে প্ররোচিত হতে পারেন। হোলকার তথা সিন্ধিয়ার ওপর প্রধান প্রভাব ফেলবে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মারাঠারা, আগেই বলেছি* এ দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ অবশেষে দৃঢ়ভাবে মাথা তুলেছে। এখানেই মহরম পার্বণটা বিশেষ রকম বিপজ্জনক। তাই বোম্বাই সৈন্যবাহিনীর একটা সাধারণ বিদ্রোহ আশা করার কিছুটা কারণ আছে। মাদ্রাজ আর্মিতে আছে ৬০,৫৫৫ জন দেশীয় সৈন্য, তারা সংগৃহীত হয়েছে হায়দরাবাদ, নাগপুর ও মালব থেকে, যেগুলি অতি গোঁড়া মুসলমান জেলা, দৃষ্টান্ত অনুসরণে এ মাদ্রাজ আর্মিও বিশেষ দেরি করবে না। তাই আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের বর্ষাকাল ব্রিটিশ সৈন্যের গতিবিধি পঙ্গু ও তাদের যোগাযোগ ব্যাহত করবে বলে যদি ধরা হয়, তাহলে এ অনুমান যুক্তিসঙ্গতই মনে হয় যে, বাহ্যিক বল সত্ত্বেও ইউরোপ থেকে পাঠানো অতিরিক্ত যে শক্তি এসে পৌঁছবে অনেক দেরিতে ও অল্প অল্প করে তা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের পক্ষে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হবে। পরবর্তী অভিযানগুলিতে আফগানিস্তান বিপর্যয়ের এক পুরভিনয়ই প্রায় আশা করতে পারি (৬৩)।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর লিখিত
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১৩৪ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ৩ অক্টোবর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে

---

* অস্ত্রত্যাগ করে — সম্পাঃ।

** চার্লস জন ক্যানিং — সম্পাঃ।

* বর্তমান সংকলন ৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

*ভারতে অভ্যুত্থান

গতকাল ‘অ্যাটলান্টিক’ ভারত থেকে যে সংবাদ এনেছে তার মধ্যে দুটি বিশিষ্ট কথা আছে যথা, লক্ষ্ণৌর সাহায্যে অগ্রসর হতে জেনারেল হ্যাভলকের ব্যর্থতা এবং দিল্লিতে ইংরেজদের জেদ করে থাকা। শেষের ঘটনাটির অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে কেবল ব্রিটিশ ইতিহাসেই এবং ওয়ালচেরেন অভিযানে (৬৪)। ১৮০৯ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সে অভিযানের ব্যর্থতা নিশ্চিত হওয়ায় তারা পুনরবতরণ নভেম্বর পর্যন্ত পেছিয়ে দেয়। ওখানে একটা ইংরেজ সৈন্যদল অবতরণ করেছে শুনে নেপোলিয়ন বলেন, ওদের আক্রমণ করতে হবে না, ওদের ধ্বংস ফরাসিরা রোগের হাতেই ছেড়ে দিক, ফ্রান্সের এক সেন্টাইমও খরচ হবে না, কামানের চেয়ে রোগেই তাদের বেশি ক্ষতি করবে নিশ্চিত। বর্তমান মহা মোগল নেপোলিয়নের চাইতেও বেশি ভাগ্যবান, তিনি দেখছেন যে রোগের সঙ্গে হামলা এবং হামলার সঙ্গে রোগ তিনি লাগাতে সমর্থ।

কাগলিয়ারি, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখের একটি ব্রিটিশ ডিসপ্যাচ আমাদের বলছে যে,

‘দিল্লির শেষ খবর ১২ আগস্টের, তখনো শহরটা বিদ্রোহীদের দখলে, কিন্তু শিগগিরই একটা আক্রমণ চালানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কেননা প্রভূত অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে জেনারেল নিকলসনের পৌঁছতে আর একদিনের মার্চ লাগবে।’

উইলসন ও নিকলসন তাঁদের বর্তমান শক্তি নিয়ে আক্রমণ না করা পর্যন্ত যদি দিল্লি দখল করা না হয়, তাহলে তার দেওয়ালগুলো আপনা থেকেই পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকবে। নিকলসনের প্রভূত শক্তির পরিমাণ হল প্রায় ৪,০০০ শিখ — দিল্লি আক্রমণের জন্য এ শক্তিটা অসম্ভব কম, কিন্তু শহরের সামনেকার হিবির না তুলে নেবার একটা আত্মহত্যাকর অজুহাত জোগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

জেনারেল হুইট কর্তৃক মিরাট বিদ্রোহীদের দিল্লি যেতে দেওয়ার ত্রুটি, সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় এমন কি অপরাধই করার পরে এবং শহরের ওপর একটা অনিয়মিত আচমকা হামলা হতে দিয়ে প্রথম দুই সপ্তাহ বৃথা কাটানোর পর দিল্লি অবরোধের পরিকল্পনা প্রায় দুর্বোধ্য একটা অপভ্রান্তি বলে মনে হয়। লন্ডন টাইমস-এর সামরিক দৈববাণীর ওপরেও যাঁকে স্থান দেব এমন এক প্রামাণ্য ব্যক্তি নেপোলিয়ন প্রায় মামুলী কথার মতো শোনাবে এমন দুটি নিয়ম নির্দেশ করেছিলেন যুদ্ধবিগ্রহের, ১ম — ‘শুধু সেই কর্তব্যই গ্রহণ করা উচিত যা সমর্থন করা যাবে এবং যেখানে সাফল্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।’ ২য় — ‘প্রধান শক্তি নিয়োগ করতে হবে শুধু সেখানে যেখানে রয়েছে যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য, শত্রুর ধ্বংস।’ দিল্লি অবরোধের পরিকল্পনায় এই প্রাথমিক নিয়মদুটো ভঙ্গ করা হয়েছে। ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষীয়দের নিশ্চয় জানার কথা যে সম্প্রতি ভারত সরকারই দিল্লির রক্ষাব্যবস্থাগুলি এমন ভাবে মেরামত করেছে যে, শহরটা অধিকার করা যায় কেবল একটা নিয়মিত অবরোধে, যাতে অন্তত ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০-এর একটা অবরোধী সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন, এবং প্রতিরক্ষা যদি গড়পড়তা কায়দায় চালানো হয় তাহলে প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। তাই এ উদ্দেশ্যে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ লোক প্রয়োজন হলে ৬,০০০ কি ৭,০০০ সৈন্য নিয়ে তা করতে যাওয়া হদ্দ বেকুবি। ইংরেজরা আরো জানত যে, একটা দীর্ঘকালীন অবরোধের ক্ষেত্রে, যা তাদের সংখ্যাল্পতার জন্য অবশ্যম্ভাবী, ওই অঞ্চলে, ওই আবহাওয়ায় ও ওই ঋতুতে তাদের সৈন্যবাহিনীকে এক অজেয় ও অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণের মুখে ফেলে দেওয়া হবে, যা ছড়াবে ধ্বংসের বীজ। তাই সাফল্যের সম্ভাবনার দিক থেকে সবই ছিল দিল্লি অবরোধের বিরুদ্ধে।

আর যুদ্ধের লক্ষ্য সে তো নিঃসন্দেহেই ভারতে ইংরেজ শাসন বজায় রাখা। সে লক্ষ্য সাধনে দিল্লি মোটেই একটা রণনৈতিক তাৎপর্যের জায়গা নয়। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ফলে দেশীয়দের চোখে তার একটা সংস্কারাচ্ছন্ন গুরুত্ব বর্তেছে সত্য, যার সঙ্গে তার আসল প্রভাবের সংঘাত আছে, এবং বিদ্রোহী সিপাহীরা যে একে তাদের সাধারণ সম্মিলন ক্ষেত্র বলে বেছে নেবে তার এই কারণটাই যথেষ্ট। কিন্তু দেশীয় কুসংস্কার

অনুসারে সামরিক পরিকল্পনা না গড়ে ইংরেজরা যদি দিল্লিকে ছেড়ে রেখে বিচ্ছিন্ন করে ফেলত, তাহলে তার কল্পিত গুরুত্ব সবই হরণ করত তারা, কিন্তু দিল্লির সামনে ছাউনি ফেলে, তাতে মাথা ঠুকে এবং তার ওপর তাদের প্রধান শক্তি ও বিশ্বের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে তারা পশ্চাদপসরণকে ভূষিত করেছে একটা বেদম পরাজয়ের সবকিছু প্রতিক্রিয়ায়। এইভাবে যে বিদ্রোহীরা দিল্লিকে তাদের অভিযানের লক্ষ্য করতে চেয়েছিল তাদেরই সাহায্য করেছে তারা। কিন্তু তাই সব নয়। ইংরেজদের একথা বোঝানোয় খুব বিরাট একটা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ছিল না যে, তাদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল একটা সক্রিয় ফিল্ড আর্মি গড়ে তোলা, যা দিয়ে অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ দমন করা, নিজেদের সামরিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা, শত্রুকে অল্প কয়েকটি জায়গায় ঠেলে দেওয়া ও দিল্লিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হত। এই সহজ ও স্বতঃস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে না এগিয়ে তারা তাদের হাতের একমাত্র সক্রিয় সৈন্যবাহিনীটিকে অচল করে রেখেছে দিল্লির সামনে তাকে কেন্দ্রীভূত করে, খোলা মাঠ ছেড়ে দিয়েছে বিদ্রোহীদের জন্য অথচ তাদের নিজেদের দুর্গসৈন্যরা আগলে আছে পরস্পর থেকে বহুদূরে সংযোগহীন ছড়ানো এক একটা জায়গায়, এবং ঘেরাও হয়ে আছে প্রচুর সংখ্যক শত্রুসৈন্যে, যারা নিজেদের খুশিমতো সময় নিতে পারছে।

প্রধান সচল বাহিনীটিকে দিল্লির সামনে নিবদ্ধ করে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের টুটি চেপে ধরেনি, নিজেদের দুর্গসৈন্যদেরই ষার করে ফেলেছে। কিন্তু দিল্লিতে এই মূল ভ্রান্তি ছাড়াও এইসব দুর্গসৈন্যরা যুদ্ধক্রিয়া যে নির্বুদ্ধিতায় চালিয়েছে তার তুলনা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল — এদের কাজকর্ম চলেছে স্বাধীনভাবে, পরস্পরের অপেক্ষা না রেখে, কোনো রকম সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ছাড়াই এবং সে কাজ চলেছে একক সৈন্যদলের সদস্য হিসাবে নয়, যেন বিভিন্ন জাতি এমন কি যেন শত্রুভাবাপন্ন জাতির সদস্যের মতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ কানপুর ও লক্ষ্ণৌর দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। দুটি সন্নিহিত জায়গা এবং আলাদা দুদল সৈন্য, কিন্তু ভারি ছোটো এবং অবস্থার তুলনায় সামান্য — তারা রইল আলাদা আলাদা কম্যান্ডের অধীনে যদিও পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ৪০ মাইল, এবং তাদের মধ্যে কাজের মিল এতই সামান্য যেন তারা দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। রণনীতির সাধারণতম নিয়মেই দরকার ছিল যেন কানপুরের সামরিক কম্যান্ডার স্যার হিউজ হুইলার অযোধ্যার চিফ কমিশনার স্যার এইচ. লরেন্সকে সসৈন্যে কানপুরে ডেকে পাঠাবার ও এইভাবে সাময়িকভাবে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে এলেও নিজ ঘাঁটি জোরদার করতে পারার অধিকার পান। এতে করে দুটি দুর্গসৈন্য রক্ষা পেত এবং পরে হ্যাভলকের সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ছোটো একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা যেত যা অযোধ্যাকে সংযত ও আগ্রাকে মুক্ত করতে পারত। তার বদলে, দুটি জায়গায় স্বাধীন যুদ্ধক্রিয়ার ফলে কানপুরের দুর্গসৈন্যরা জবাই হল, লক্ষ্ণৌর কেল্লা সহ তার রক্ষী সৈন্যদের পতন এখন নিশ্চিত এবং হ্যাভলক যে তাঁর সৈন্যদের ১২৬ মাইল হাঁটিয়ে আনলেন আট দিনে, মার্চে যত দিন লেগেছে ততকটিই লড়াই লড়লেন, এবং তা সব করলেন ভারতীয় আবহাওয়ায়, ভর গ্রীষ্মে — তাঁর চমৎকার বীরোচিত প্রচেষ্টা পর্যন্ত নিষ্ফল হয়েছে। লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তাঁর অতিপরিশ্রান্ত সৈন্যদের আরো হয়রাণ করে, কানপুর থেকে নিয়ত ক্ষীয়মাণ ব্যাসার্ধের ওপর চালানো বারম্বার অভিযানে নিষ্ফল আত্মবলিতে নিশ্চিতই বাধ্য হয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত খুবই সম্ভব এলাহাবাদে ফিরে যেতে হবে, এবং খুব কম সৈন্যই থাকবে তাঁর পেছনে। তাঁর সৈন্যদের কাজকর্ম থেকেই সবচেয়ে বেশি করে দেখা যায়, একটা মহামারীর ছাউনিতে জীবন্ত ধরা পড়ার বদলে ফিল্ড অ্যাকশনের জন্য কেন্দ্রীভূত হলে দিল্লির সম্মুখস্থ ছোট্ট ইংরেজ সৈন্যদলটাও কী করতে পারত। রণনীতির মূলকথা হল কেন্দ্রীকরণ। ভারতে ইংরেজরা যে পরিকল্পনা নিয়েছে সেটা বিকেন্দ্রীকরণ। তাদের করণীয় হত দুর্গসংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা, সেখান থেকে নারী ও শিশুদের অবিলম্বে সরানো, রণনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন সমস্ত স্টেশন ছেড়ে আসা এবং এইভাবে ফিল্ডের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভব সৈন্যদল সংগ্রহ করা। কিন্তু কলকাতা থেকে গঙ্গা বেয়ে যে বিন্দু বিন্দু অতিরিক্ত বলের জোগান গিয়েছে তা অসংখ্য বিচ্ছিন্ন দুর্গগুলিতে এমন নিঃশেষে খেয়ে গেছে যে একটা ডিট্যাচ্‌মেন্টও এলাহাবাদে পৌঁছয়নি।

আর লক্ষ্ণৌর ব্যাপারে আগের ডাকটায়* যে অতি দুর্ভাবনা জেগেছিল তা এখন সমর্থিত হয়েছে। হ্যাভলক ফের কানপুরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, মৈত্রীবদ্ধ নেপালি সৈন্যদের কাছ থেকে কোনো

সাহায্যের সম্ভাবনা নেই, অনশনের চাপে জায়গাটি দখল ও স্ত্রীপুত্র সহ তার সাহসী রক্ষীদের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনব বলে এবার আমরা আশা করতে পারি।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১৪২ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ১৩ অক্টোবর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

* বর্তমান সংকলনের ৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

*ভারতে অভ্যুত্থান (৬৫)

ভারতীয় বিদ্রোহের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় প্রথম থেকে যে আশাবাদের চর্চা চলেছে তাতেই তা ভরপুর। জানানো হল দিল্লির ওপর একটা সফল আক্রমণ হবে তাই নয়, ২০ আগস্টেই তা হওয়ার কথা। অবশ্যই প্রথম স্থির করতে হয় অবরোধকারী বাহিনীর বর্তমান বল। ১৩ আগস্ট দিল্লির সামেনকার শিবির থেকে একজন গোলন্দাজ অফিসার যা লিখেছেন তাতে ওই মাসের ১০ তারিখে কার্যকরী ব্রিটিশ বলের নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। (১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

দিল্লির সামনেকার শিবিরে কার্যকরী মোট সৈন্য তাহলে ১০ আগস্ট কাঁটায় কাঁটায় ৫,৬৪১ জন। এ থেকে ১২০ জনকে (১১২ জন সৈন্য ও ৮ জন অফিসার) বাদ দিতে হবে, ইংরেজ রিপোর্ট অনুসারে, ইংরেজদের বামভাগের সামনে প্রাচীরের বাইরে বিদ্রোহীরা যে একটি নতুন ব্যাটারি খোলে তার ওপর ১২ আগস্টে আক্রমণের সময় এরা হতাহত হয়। তাই ৫,৫২১ জন লড়ুইয়ে লোক ছিল সেখানে, যখন ব্রিগেডিয়ার নিকলসন একটি দ্বিতীয় শ্রেণির দখলি ট্রেন পাহারা দিয়ে ফিরোজপুর থেকে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে যোগ দেয় নিম্নলিখিত বল নিয়ে, ৫২ নং হালকা পদাতিক (ধরা যাক ৯০০ লোক), ৬১ নং-এর একটা ভাগ (ধরা যাক ৪টি কোম্পানি, ৩৬০ জন সৈন্য), বাউচেরের ফিল্ড ব্যাটারি, ৬ নং পঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা ভাগ (ধরা যাক ৫৪০ সৈন্য) এবং কিছু মুলতান

	ব্রিটিশ অফিসার	ব্রিটিশ সৈন্য	দেশীয় অফিসার	দেশীয় সৈন্য	ঘোড়া
স্টাফ	৩০	...	...	...	...
গোলন্দাজ	৩৯	৫৯৮	...	...	...
ইঞ্জিনিয়র	২৬	৩৯	...	...	...
ঘোড়সওয়ার	১৮	৫৭০	...	...	৫২০
১ম ব্রিগেড					
মহারানির ৭৫ নং রেজিমেন্ট	১৬	৫০২	...	...	...
মহিম্ন কোম্পানির ২ নং ফিউজিলিয়র	১৭	৪৮৭	...	...	...
কুমায়ুন ব্যাটালিয়ন	৪	...	১৩	৪৩৫	...

২য় ব্রিগেড

মহারানির ৬০ নং রাইফেল	১৫	২৫১	. . .	. . .	. . .
মহিম্ন কোম্পানির ২ নং ফিউজিলিয়র	২০	৪৯৩	. . .	. . .	. . .
তৈমুর ব্যাটালিয়ন	৪	. . .	৯	৩১৯	. . .

৩য় ব্রিগেড

মহারানির ৮ নং রেজিমেন্ট	১৫	১৫৩	. . .	. . .	. . .
মহারানির ৬১ নং রেজিমেন্ট	১২	২৪৯	. . .	. . .	. . .
৪ নং শিখ	৪	. . .	৪	৩৬৫	. . .
গাইড কোর	৪	. . .	৪	১৯৬	. . .
কোকস কোর	৫	. . .	১৬	৭০৯	. . .
মোট	২২৯	৩,৩৪২	৪৬	২,০২৪	৫২০

ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক, সর্বসমেত ২,০০০ লোকের একটা সৈন্য যার মধ্যে ১,২০০-র কিছু বেশি ইউরোপীয়। নিকলসনের সৈন্যদের সঙ্গে মিলনের সময় শিবিরে যে ৫,৫২১ জন লড়ুইয়ে ছিল তাদের সংখ্যা এর সঙ্গে যোগ করলে পাই মোট ৭,৫২১ জন সৈন্য। শোনা যাচ্ছে পঞ্জাবের লাট স্যার জন লরেন্স আরো সৈন্য পাঠিয়েছেন — তাতে আছে পদাতিকের বাকি অংশটা, ২৪ নং-এর তিনটে কোম্পানি, সেই সঙ্গে পেশোয়ার থেকে ক্যাপটেন পেটনের সৈন্যদের তিনটি ঘোড়ায় টানা কামান, ২ নং পঞ্জাব পদাতিক, ৪ নং পঞ্জাব পদাতিক এবং ৬ নং পঞ্জাবের অন্য অংশটা। এই যে সৈন্যদলটাকে আমরা বড়ো জোর ৩,০০০ জনল বলে ধরতে পারি, এবং যার অধিকাংশই শিখ, তা কিন্তু এখনো এসে পৌঁছয়নি। মাসখানেক আগে চেম্বারলেনের* নেতৃত্বে পঞ্জাব অতিরিক্ত সৈন্যদের আগমনের কথা স্মরণ করলে পাঠক বুঝবেন যে, সে সৈন্য জোগানে যেমন জেনারেল রিডের সৈন্যসংখ্যা স্যার এইচ. বার্নার্ডের আদি সৈন্য সংখ্যাটায় কেবল ফিরে আসে, নতুন এই সৈন্য জোগানটাতেও তেমনি ব্রিগেডিয়ার ইউলসনের সৈন্যসংখ্যা জেনারেল রিডের আদি শক্তির সমমাত্রায় উঠতে পারবে মাত্র, ইংরেজদের পক্ষে অনুকূল একমাত্র সত্য ঘটনা হল অন্তত একটি দখলি-ট্রেনের আগমন। কিন্তু ধরাই যাক যে প্রত্যাশিত ৩,০০০ সৈন্যই শিবিরে যোগ দিল এবং মোট ইংরেজ সৈন্যের পরিমাণ দাঁড়াল ১০,০০০, যার এক তৃতীয়াংশের বিশ্বস্ততা সন্দেহজনক। সে ক্ষেত্রে কী করবে তারা? বলা হচ্ছে তারা দিল্লি অবরোধ করবে। কিন্তু সাত মাইলেরও বেশি পরিধির একটা অতি সুরক্ষিত শহরকে ১০,০০০ সৈন্য দিয়ে অবরোধ করার হাস্যকর কল্পনার কথা বাদ দিলেও, দিল্লি অবরোধের কথা ভাবার আগে যমুনার চলতি গতিপথটাকে ইংরেজদের প্রথমে বদলানো দরকার। ইংরেজরা যদি সকাল নাগাদ দিল্লি ঢোকে, তাহলে সন্ধ্যা নাগাদ বিদ্রোহীরা দিল্লি ছেড়ে যেতে পারে হয় যমুনা পার হয়ে রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যার দিকে, নয় যমুনা বরাবর মার্চ করতে পারে মথুরা ও আগ্রার অভিমুখে। যাই হোক না কেন, যে বর্গক্ষেত্রটার এক দিকটা অবরোধকারীদের অনধিগম্য অথচ অবরুদ্ধদের যোগাযোগ ও পশ্চাদপসরণের পথ জোগাচ্ছে, তা অবরোধ করার সমস্যা এখনো সমাধান হয়নি।

আগের তালিকাটা যার কাছ থেকে নিয়েছি সে অফিসার বলেছেন, ‘আক্রমণ করে দিল্লি অধিকার করা যে প্রশ্নাতীত এ বিষয়ে সবাই একমত।’

সেই সঙ্গে শিবিরে সত্যিই কী আশা করা হচ্ছে সেটাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন, অর্থাৎ — 'কয়েকদিন ধরে শহরে গোলা দেগে একটা খাসা ভাঙন ঘটানো।' অফিসারটি কিন্তু নিজেই যোগ করেছেন :

'একটা সংযত হিসাবে, শত্রু এখন নিশ্চয় হাজার চল্লিশেক সৈন্য জড়ো করে থাকবে, তাছাড়া তাদের আছে অসংখ্য বেশ কার্যকরী কামান, পদাতিকরাও ভালো লড়ছে।'

দেওয়ালের পেছন দিকে যে মরীয়া জেদের সঙ্গে মুসলমানরা লড়তে অভ্যস্ত তার কথা ধরলে সত্যই খুবই প্রশ্ন জাগে ক্ষুদ্র ব্রিটিশ বাহিনী 'একটা খাসা ভাঙনের' মধ্য দিয়ে ধেয়ে ঢোকার পর ফের ধেয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবে কিনা।

বস্তুত, বর্তমান ব্রিটিশ সৈন্যগণ কর্তৃক দিল্লির ওপর কোনো সফল আক্রমণের সম্ভাবনা শুধু একটা ক্ষেত্রেই থাকছে — বিদ্রোহীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিভেদ, তাদের গোলাবারুদ নিঃশেষ, সৈন্যদের মনোবলে ভাঙন ও আত্মবিশ্বাসের প্রেরণা অদৃশ্য হওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে ৩১ জুলাই থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত তাদের অব্যাহত লড়াই থেকে এ অনুমান প্রায় করা চলে না বলেই মনে হয়। সেই সঙ্গে কলকাতার একটি চিঠি থেকে পরিষ্কার ইঙ্গিত মিলছে কেন সমস্ত সামরিক নিয়মের বিরুদ্ধেও ইংরেজ জেনারেলরা দিল্লির সামনে মাটি আঁকড়ে থাকতে দৃঢ়সংকল্প।

এতে বলা হয়েছে, 'কয়েক সপ্তাহ আগে যখন দিল্লি থেকে আমাদের সৈন্য পশ্চাদপসরণ করবে কিনা এ প্রশ্ন ওঠে, কারণ দৈনন্দিন লড়াইয়ে তারা এতই বিপর্যস্ত যে অপরিসীম ক্লান্তি আর সইতে পারছিল না, তখন স্যার জন লরেন্স এ অভিপ্রায়ের তীব্র বিরোধিতা করেন, জেনারেলদের তিনি খোলাখুলি জানিয়ে দেন যে, তাঁদের পশ্চাদপসরণ করাটা হবে আশেপাশের জনসাধারণের অভ্যুত্থানের একটা সংকেত, তার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ বিপন্ন হয়ে পড়বেন। এই মত মেনে নেওয়া হয় ও স্যার জন লরেন্স তাঁর যথাসাধ্য সমস্ত রকম অতিরিক্ত সৈন্যবল তাঁদের জন্য পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।'

স্যার জন লরেন্স পঞ্জাবকে যেরকম নির্বল করেছেন তাতে পঞ্জাবই এখন বিদ্রোহ করে বসতে পারে অথচ দিল্লির সামনেকার ছাউনির সৈন্যরা সম্ভবত শয্যাশায়ী হবে, আর বর্ষার শেষে মাটি থেকে ওঠা মড়ক-ভাপে ক্ষয় পেতে থাকবে। জেনারেল ভ্যান কোর্টল্যান্ডের যে সৈন্যরা চার সপ্তাহ আগে হিসার পৌঁছয় ও দিল্লির* দিকে এগুচ্ছে বলে খবর এসেছে, তাদের সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যায়নি। তারা নিশ্চয় গুরুতর বাধা পেয়েছে, নতুবা পথেই তাদের ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

গঙ্গার উজান এলাকায় ইংরেজদের বস্তুতপক্ষে মরীয়া অবস্থা। অযোধ্যা বিদ্রোহীদের যুদ্ধকর্মে জেনারেল হ্যাভলক বিপন্ন, এরা লক্ষ্ণৌ থেকে বিথুর হয়ে এগুচ্ছে ও কানপুরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ফতেপুরে জেনারেল হ্যাভলকের পশ্চাদপসরণের পথ কেটে দিতে চাইছে, আর সেই সঙ্গে যমুনার দক্ষিণ তীরের একটা শহর কল্পি থেকে গোয়ালিয়র বাহিনী মার্চ করছে কানপুর অভিমুখে। এই অভিকেন্দ্রিক গতিবিধিটা সম্ভবত নানা সাহেবের পরিকল্পনা, যিনি লক্ষ্ণৌর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে — এ থেকে বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে এই প্রথম রণনীতির খানিকটা ধারণা প্রকাশ পেল, অথচ ইংরেজরা যেন তাদের কেন্দ্রাতিগ যুদ্ধের নির্বোধ পদ্ধতিটাই বাড়িয়ে যেতে ব্যস্ত। তাই শোনা গেল, জেনারেল হ্যাভলকের শক্তিবৃদ্ধির জন্য যে ৯০ নং পদাতিক ও ৫ নং ফিউজিলিয়রদের কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছিল তাদের স্যার জেমস উট্র্যাম দানাপুরে থামিয়েছেন, তাঁর মাথায় খেলেছে যে তাদের তিনি পরিচালিত করে নিয়ে যাবেন ফৈজাবাদ হয়ে লক্ষ্ণৌ। যুদ্ধকর্মের এই পরিকল্পনাটাকে লন্ডনের ৯প্র ৄ=ত্রঁ% স্প্রেত্রক্সক্ষপ্রত্র (৬৬) একটা ওস্তাদী মার বলে অভিনন্দিত করেছে, কারণ, এ পত্রিকার মতে, লক্ষ্ণৌ এই ভাবে দুই আগুনের মাঝখানে পড়বে, দক্ষিণে কানপুর ও বামে ফৈজাবাদ থেকে বিপন্ন হবে তা। যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম অনুসারে অতীব দুর্বল যে সৈন্যবাহিনীটা তার বিচ্ছিন্ন সভ্যদের সমবেত করার বদলে এমন দুটো খণ্ডে নিজেকে খণ্ডিত করে যার মাঝখানে সমগ্র শত্রুসৈন্যের ব্যবধান, সে বাহিনী শুধু তাকে ধ্বংসের কষ্টটা থেকে শত্রুকে রেহাই দেয়। জেনারেল হ্যাভলকের পক্ষে আসলে প্রশ্নটা এখন আর লক্ষ্ণৌ বাঁচানো নয়, নিজের সৈন্যের বাদবাকিদের এবং জেনারেল নিলের ছোট্ট কোরটির

অবশিষ্টাংশ বাঁচানো। খুবই সম্ভবত তাঁকে ফিরে যেতে হবে এলাহাবাদে। বস্তুত, এলাহাবাদ চূড়ান্ত গুরুত্বের একটা জায়গা, কারণ তা হল গঙ্গা যমুনার সংযোগস্থল এবং দুই নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলের চাবিকাঠি।

মানচিত্রে চোখ বুলালেই দেখা যাবে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির পুনর্বিজয়ে সচেষ্ট ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধকর্মের প্রধান পথটা হল নিম্নগঙ্গার উপত্যকা বরাবর। দানাপুর, বারাণসী, মির্জাপুর এবং সর্বোপরি এলাহাবাদ — যেখান থেকে আসল যুদ্ধাভিযান চলবে — এগুলোকে তাই খাস বাংলা প্রদেশের ছোটোখাটো ও রণনীতির দিক থেকে গুতুত্বহীন সমস্ত স্টেশনের দুর্গসৈন্যদের টেনে এনে শক্তিশালী করা চাই। যুদ্ধকর্মের এই প্রধান পথটাই যে বর্তমানে গুরুতর বিপন্ন তা দেখা যাবে ৯প্র্ল=ঁ=ঁ ত্মদজ্জ জ্মপ্রভক্ষ পত্রিকা সমীপে একটি বোম্বাই পত্রের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে :

‘দানাপুরে তিনটি রেজিমেন্টের বিগত বিদ্রোহে এলাহাবাদ ও কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ (নদীপথে স্টিমারযোগে ছাড়া) ছিন্ন হয়ে গেছে। সম্প্রতিকালে যা ঘটেছে তার মধ্যে দানাপুর বিদ্রোহটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ কলকাতা থেকে ২০০ মাইলের মধ্যে গোটা বিহার জেলা এখন প্রজ্বলিত। আজ একটা খবর এসেছে যে, সাঁওতালরা ফের উত্থিত হয়েছে এবং রক্তপাত ও লুটপাটেই যাদের আনন্দ এমন ১,৫০,০০০ বন্যে বাংলা রাজ্য ছেয়ে গেলে সত্যিই ভয়ঙ্কর ব্যাপার হতে পারে।’

আগ্রা যতদিন টিকে থাকছে ততদিন যুদ্ধকর্মের গৌণ পথ বোম্বাই আর্মির পক্ষে ইন্দোর ও গোয়ালিয়র হয়ে আগ্রা, মাদ্রাজ আর্মির পক্ষে সাগর ও গোয়ালিয়র হয়ে আগ্রা, এই আগ্রার সঙ্গে পঞ্জাব আর্মির এবং এলাহাবাদ রক্ষাকারী কোরটির যোগাযোগ পথও পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। মধ্য ভারতের দোদুল্যমান রাজারা যদি প্রকাশ্যেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে এবং বোম্বাই আর্মির মধ্যে বিদ্রোহ গুরুতর রূপ ধারণ করে তাহলে সবরকম সামরিক জল্পনারই আপাতত অবসান হবে এবং কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত একটা অপরিসীম হত্যাকাণ্ড ছাড়া কিছুই নিশ্চিত থাকবে না। সর্বোত্তম ক্ষেত্রে যা করা যায়, তা হল নভেম্বরে ইউরোপীয় সৈন্যদের আগমন পর্যন্ত সমস্ত নির্ধারক ঘটনা পেছিয়ে দেওয়া। এটুকুও করা যাবে কিনা তা নির্ভর করবে স্যার কলিন ক্যামবেলের মস্তিষ্কের ওপর, এ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত সাহস ছাড়া আর কিছুই শোনা যায়নি। তিনি যদি তাঁর পদের উপযুক্ত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে যে কোনো মূল্যেই, দিল্লির পতন হোক বা না হোক, রণক্ষেত্রে দাঁড়াবার মতো একটা সৈন্যবাহিনী তিনি গড়ে তুলবেন, তা সে যত ছোটোই হোক। তবু, ফের বলি, শেষ সিদ্ধান্ত রয়েছে বোম্বাই আর্মির হাতে।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ৬ অক্টোবর লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১৫১ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ২৩ অক্টোবর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

* এই সংকলনের ৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য — সম্পাঃ।
* বর্তমান সংকলনের ৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

*ভারতে অভ্যুত্থান

‘আরাবিয়া’র ডাকে দিল্লি পতনের গুরুত্বপূর্ণ খবর এসেছে। অত্যল্প খুঁটিনাটি যেটুকু হাতে আছে তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এ ঘটনা ঘটেছে সম্ভবত যুগপৎ বিদ্রোহীদের মধ্যে তীব্র বিভেদ, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ের আনুপাতিক সংখ্যার পরিবর্তন এবং বহু পূর্বেই ৮ জুন থেকে যার প্রত্যাশা সেই দখলি ট্রেনটির ৫ সেপ্টেম্বর আগমনের ফলে।

নিকলসনের অতিরিক্ত সৈন্য আসার পর আমরা দিল্লির সম্মুখস্থ সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যা ধরে ছিলাম ৭,৫২১ জন*, এ হিসাব পরে পূর্ণ সমর্থিত হয়েছে। পরে রাজা রণবীর সিংহ কর্তৃক ধার দেওয়া ৩,০০০ কাশ্মীরী সৈন্য আসায় ব্রিটিশ সৈন্য The Friend of India-র (৬৭) মতে, সর্বসমেত প্রায় ১১,০০০ জনে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, লন্ডনের The Military Spectator (৬৮) জোর দিয়ে বলছে যে, বিদ্রোহী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ১৭,০০০-এ নেমে গিয়েছিল, তার মধ্যে ৫,০০০ জন অশ্বারোহী, কিন্তু The Friend of India তাদের সংখ্যা ধরছে প্রায় ১৩,০০০, যার মধ্যে ১,০০০ অনিয়মিত ঘোড়সওয়ার। একবার ভাঙন ঘটলে ও শহরের অভ্যন্তরে লড়াই শুরু হয়ে গেলে ঘোড়সওয়ার যেহেতু একেবারেই অকেজো, এবং সুতরাং ইংরেজদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু তারা পালায়, তাই The Military Spectator অথবা The Friend of India যার হিসাবই ধরি না কেন, সিপাহীদের মোট সৈন্য ১১,০০০ কি ১২,০০০-এর বেশি বলে হিসাব করা যায় না। ইংরেজ সৈন্য তাই স্বপক্ষের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ততটা নয়, যতটা বিপক্ষের সংখ্যাহ্রাসের জন্য প্রায় বিদ্রোহীদের সমান হয়ে ওঠে, তাদের সংখ্যাগত ঈষৎ স্বল্পতা অনেক বেশি পুষিয়ে যায় একটা সফল গোলাবর্ষণের নৈতিক প্রভাবে এবং আক্রমণ-পক্ষের সুবিধায়, যাতে তারা কোথায় প্রধান শক্তি নিয়োগ করবে তা নিজেরা বেছে নিতে পারে অথচ প্রতিরক্ষাকারীরা বাধ্য হয় তাদের অপ্রতুল শক্তিটাকে বিপন্ন পরিধিটার সবখানে ছড়িয়ে রাখতে।

বিদ্রোহী শক্তিদের যে সংখ্যাহ্রাস ঘটে সেটা প্রায় দশ দিন যাবৎ অবিরাম হামলায় যে গুরুতর ক্ষতি সইতে হয় তার চাইতেও আভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে গোটাগুটি এক একটা দলের ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যই বেশি। যেমন মোগল ছায়ামূর্তি নিজেও তেমনি দিল্লির ব্যবসায়ীরাও বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন সিপাহীদের শাসনে, তাদের সঞ্চিত প্রতিটি টাকা তারা লুঠ করেছে — আর সেই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে বিভেদ, পুরাতন দুর্গসৈন্যদের সঙ্গে নবাগত সৈন্যদের যে ঝগড়া চলে, তা তাদের ভাসাভাসা সংগঠন ভেঙে ফেলে তাদের পতন নিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু, ইংরেজদের যেহেতু এমন এক শত্রুর মোকাবিলা করতে হয় যারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে কিছুটা বেশি হলেও অধিনায়কত্বহীন, নিজেদের মধ্যেই বিভেদের ফলে যারা দুর্বল ও হতোদ্যম, অথচ ৮৪ ঘণ্টার গোলাবর্ষণের পর ছয় দিন নিঃসাড়ে নৌকার সাঁকো দিয়ে যমুনা পার হয়ে যায়, তাই মানতেই হবে যে বিদ্রোহীরা তাদের প্রধান সৈন্যবাহিনীর ক্ষেত্রে সর্বনিকৃষ্ট পরিস্থিতির সর্বোত্তম ব্যবহারই করেছে।

দখলের ঘটনাটা মনে হয় এই রকম — ৮ সেপ্টেম্বর ইংরেজ ব্যাটারি স্থাপিত হল তাদের আদি অবস্থান থেকে অনেকখানি এগিয়ে এবং দেওয়ালের ৭০০ গজের মধ্যে। ৮ থেকে ১১ তারিখ ব্রিটিশ ভারি কামান ও মর্টার আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গাঁথনির কাছে, একটা আস্তানা গাড়া হয় ও ব্যাটারি স্থাপিত করা হয় অল্পই ক্ষতিতে — কারণ মনে রাখা দরকার যে, দিল্লি দুর্গসৈন্যরা ১০ ও ১১ তারিখে দুটি হামলা করে, নতুন ব্যাটারি স্থাপন করার জন্য বারবার চেষ্টা করে ও রাইফেল বিবর থেকে প্রবল গুলিবর্ষণ বজায় রাখে। ১২ তারিখে ইংরেজদের ক্ষতি হয় হাতহতে প্রায় ৫৬ জন। ১৩ তারিখের সকালে একটা ঘাঁটিতে শত্রুদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বারুদখানা উড়িয়ে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হয় একটা হালকা কামানের গাড়ি, তালওয়ারা উপকণ্ঠ থেকে এটি গোলা দাগছিল ব্রিটিশ ব্যাটারির ওপর, এবং কাশ্মীর গেটের কাছে একটি কার্যকরী ভাঙন ঘটায় ব্রিটিশ ব্যাটারি। ১৪ তারিখে আক্রমণ করা হয়ে শহরের ওপর। কাশ্মীর গেটের কাছে ভাঙনটায় প্রবেশ করে সৈন্যরা, গুরুতর বাধা পেতে হয় না, আশেপাশের বড়ো বড়ো বাড়িগুলো দখল করে এবং র‍্যাম্পার্ট বরাবর মোরী ঘাঁটি ও কাবুল গেটের দিকে এগোয়, প্রতিরোধ তখন মরীয়া হয়ে ওঠে ও সেই হেতু ক্ষতি হয় গুরুতর। দখল করা ঘাঁটি থেকে শহরের ওপর কামান চালানো ও কম্যান্ডিং জায়গাগুলোয় আরো কামান ও মর্টার নিয়ে আসার আয়োজন চলে। ১৫ তারিখে বার্ন ও লাহোর ঘাঁটির ওপর কামান চালানো হয় মোরী ও কাবুল ঘাঁটিতে দখল করা কামান থেকে, আর ভাঙন ঘটানো হয় অস্ত্রাগারে ও গোলা দাগা শুরু হয় রাজপ্রাসাদে। অস্ত্রাগার চড়াও হয়ে দখল করা হয় ১৬ সেপ্টেম্বর দিবালোকে, আর ১৭ তারিখে অস্ত্রাগারের ঘেরাও থেকে মর্টার চালানো হয় রাজপ্রাসাদের ওপর।

The Bombay Courier (৬৯) বলছে, সিন্ধু সীমান্তে পঞ্জাব ও লাহোর ডাক লুঠ হওয়ায় আক্রমণের সরকারি বিবরণ এই তারিখ থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। বোম্বাই লাটের কাছে প্রেরিত একটা ব্যক্তিগত পত্রে বলা হয় যে, দিল্লির গোটা শহরটা দখল করা হয় রবিবারে, ২০ তারিখে, বিদ্রোহীদের প্রধান শক্তিটা ওই দিন ভোর তিনটেয় নৌকার সাঁকোর ওপর দিয়ে শহর ছেড়ে চলে যায় রোহিলখণ্ডের দিকে। নদী ফ্রন্টে অবস্থিত সেলিমগড় দখল না করা পর্যন্ত ইংরেজদের পক্ষ থেকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন যেহেতু অসম্ভব হয়, তাই একথা স্পষ্ট যে, বিদ্রোহীরা শহরের একেবারে উত্তর প্রান্ত থেকে তার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত লড়তে লড়তে ক্রমশ সরে আসে ও পশ্চাদপসরণ সমাধার মতো অবস্থান বজায় রাখে ২০ পর্যন্ত।

আর দিল্লি দখলের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য সূত্র, The Friend of India-র মন্তব্য হল :

'এই সময় ইংরেজদের মনোযোগ আবদ্ধ হওয়া উচিত দিল্লির অবস্থা নিয়ে নয়, বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে। দ্রুত সাফল্যে যা কিছু মর্যাদা অর্জন করা যেত, শহর দখলে দীর্ঘ বিলম্বে তা আসলে চূর্ণই হয়েছে, এবং বিদ্রোহীদের শক্তি ও সংখ্যা শহর দখল করে যতটা কমানো সম্ভব, অবরোধ বজায় রেখে ঠিক তেমনি কার্যকরীভাবেই কমানো যায়।'

ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে, অভ্যুত্থান ছড়াচ্ছে কলকাতার উত্তর-পূর্বে, মধ্য ভারত হয়ে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত, আর আসাম সীমান্তে পূর্বীয়াদের দুটি শক্তিশালী রেজিমেন্ট প্রকাশ্যে ভূতপূর্ব রাজা পুরন্দর সিংহকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করে বিদ্রোহ করেছে, দানাপুর ও রঙ্গপুরের বিদ্রোহীরা কানোয়ার সিংহের নেতৃত্বে বান্দা ও নাগোদ হয়ে জব্বলপুরের দিকে যাচ্ছে এবং স্বীয় সৈন্যের জোরে রেওয়ার রাজাকে বাধ্য করেছে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। খাস জব্বলপুরেই ৫২ নং বেঙ্গল দেশীয় রেজিমেন্ট সৈন্যনিবাস ছেড়ে গেছে, পেছনে রেখে আসা সাথীদের জন্য জামীন হিসাবে সঙ্গে নিয়ে গেছে একজন ব্রিটিশ অফিসারকে। গোয়ালিয়র বিদ্রোহীরা শোনা যাচ্ছে চম্বল পার হয়ে ছাউনি ফেলেছে নদী ও ঢোলপুরের মাঝখানে কোনো একটা জায়গায়। সংবাদের সবচেয়ে গুরুতর ঘটনাটি লক্ষণীয়। মনে হচ্ছে যোধপুর সৈন্যদল আরোয়া-র বিদ্রোহী রাজার কাজ করেছে, জায়গাটা বিয়াওয়ার থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। যোধপুরের রাজা তাদের বিরুদ্ধে একটা বড়ো সৈন্যদল পাঠায়, তাদের তারা পরাস্ত করে, জেনারেল ও ক্যাপ্টেন মাঙ্ক মেসনকে নিহত করে ও দখল করে ৩টি কামান। নাসিরাবাদ সৈন্যদলের কিয়দংশ নিয়ে জেনারেল জি. এস. পি. লরেন্স তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন ও তাদের একটা শহরে হটে যেতে বাধ্য করেন, এ শহরের বিরুদ্ধে তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা কিন্তু নিষ্ফল হয়। সিন্ধু থেকে ইউরোপীয় সৈন্যদের সরিয়ে আনার ফল হয়েছে একটা দূরবিস্তৃত ষড়যন্ত্র, হায়দরাবাদ, করাচি ও শিকারপুর সমতে অন্তত ৫টি বিভিন্ন জায়গায় অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। পঞ্জাবেও অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, মুলতান ও লাহোরের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে ছিল আট দিন ধরে।

অন্যত্র পাঠকেরা ১৮ জুন থেকে ইংলন্ড হতে যেসব সৈন্য পাঠানো হয়েছে তার একটা তালিকাকারে বিবরণ দেখবেন, বিভিন্ন জাহাজের পৌঁছাবার তারিখ হিসাব করা হয়েছে সরকারি বিবৃতি থেকে, সুতরাং তা ব্রিটিশ সরকারের অনুকূলে (৭০)। এই তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, স্থলপথে প্রেরিত গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়রদের ছোটো ছোটো ডিট্যাচমেন্টগুলি ছাড়া মোট যে সৈন্যদল অবতরণ করেছে তার সংখ্যা ৩০,৮৯৯ জন, তাদের মধ্যে ২৪,৮৮৪ জন পদাতিক, ৩,৮২৬ ঘোড়সওয়ার ও ২,৩৩৪ গোলন্দাজ বাহিনীর। আরো দেখা যাবে যে, অক্টোবরের শেষের আগে কোনো মোটা রকমের সৈন্যপ্রেরণ আশা করা যায় না।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ৩০ অক্টোবর লিখিত
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১৭০ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ১৪ নভেম্বর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে

---

* বর্তমান সংকলনের ১০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য — সম্পাঃ।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

*দিল্লি দখল

চড়াও আক্রমণে যে সৈন্যদল দিল্লি দখল করে তাদের সাহসিকতাকে গ্রেট বৃটেনে যে সরব ঐকতানে আকাশে তোলা হচ্ছে তাতে আমরা যোগ দেব না। বিশেষ করে সাহসিকতার প্রশ্ন উঠলে কোনো জাতি এমন কি ফরাসিরাও আত্মপ্রশংসায় ইংরেজদের পাল্লা দিতে পারে না। ঘটনার বিশ্লেষণ করলে কিন্তু অচিরেই শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রেই এই বীরত্বের ঘটা নিতান্ত মামুলী ব্যাপার বলে দেখা যাবে, এবং স্বদেশে যারা নিশ্চিন্তে দিন কাটায়, সামরিক গৌরব অর্জনের সুদূরতম সম্ভাবনার যে-কোনো বিপদের প্রতিই যাদের অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা, সেই ইংরেজ[illegible] দিল্লি আক্রমণে যে নিঃসন্দেহ, যদিও তেমন অসাধারণ কিছু নয়, সাহসিকতা দেখা গেছে তার অংশীদার বলে নিজেদের চালাবার চেষ্টা করছে — পরের সাহস নিয়ে এই অতি ব্যবসাদারিতে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন প্রতিটি লোকই ঘেন্না বোধ করবে।

দিল্লির সঙ্গে সেভাস্তপলের তুলনা করলে অবশ্যই মানতে হবে যে, সিপাহীরা রুশী নয়, ব্রিটিশ সৈন্যাবাসের বিরুদ্ধে তাদের কোনো হামলাই ইঙ্কেরমানের (৭১) মতো নয়, কোনো ততলেবেন ছিল না দিল্লিতে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি সৈন্য ও কোম্পানি সাহসের সঙ্গে লড়লেও সিপাহীরা ছিল একান্তই নেতৃহীন এবং তা শুধু ব্রিগেড ও ডিভিসনের বেলায় নয়, এমন কি প্রায় ব্যাটালিয়নগুলির ক্ষেত্রেও, তদের সংহতি তাই কোম্পানি ছাড়িয়ে বেশি এগোয়নি, এবং বর্তমান কালে যে বৈজ্ঞানিক উপাদান ছাড়া সৈন্যবাহিনী অসহায় এবং শহর রক্ষা একান্ত নিষ্ফল, তা তাদের মোটেই ছিল না। তবু সংখ্যা ও সমরোপায়ের অসমানুপাতে, আবহাওয়া সহ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের তুলনায় সিপাহীদের উৎকর্ষে, দিল্লির সামনেকার সৈন্যবাহিনী মাঝে মাঝে যে চূড়ান্ত স্বল্পতায় নেমে যায় তাতে ওই তফাৎগুলির অনেকটাই পুষিয়ে যায় ও দুটি অবরোধের মধ্যে (এই যুদ্ধকর্মগুলিকে যদি অবরোধ বলা যায়) একটা ন্যায্য তুলনা সম্ভব হতে পারে। দিল্লি দখলকে আমরা অসাধারণ বা অতি বীরোচিত একটা সাহসের কাজ বলে গণ্য করি না, যদিও যে-কোনো লড়াইয়ের মতোই দুপক্ষ থেকে অবশ্যই অতি উদ্দীপনাময় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু একথা বলি যে, সেভাস্তপল ও বালাক্লাভার (৭২) মধ্যে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে যখন আত্মপরীক্ষা দিতে হয় তখন তারা যা দেখিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অধ্যবসায়, চরিত্রবল, বিচার ও নৈপুণ্য দেখিয়েছে দিল্লির সম্মুখস্থ ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। প্রথমোক্তরা ইঙ্কেরমানের পরে পুনরাবতরণে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিল এবং ফরাসিরা না থাকলে তা করতও নিঃসন্দেহে। আর শেযোক্তদের বেলায় বিশেষ ঋতু, তৎকারণপ্রসূত মারাত্মক পীড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার ভাঙ্গন, দ্রুত অতিরিক্ত সৈন্য প্রাপ্তির সর্বসম্ভাবনার অনুপস্থিতি, সমগ্র উত্তর ভারতের অবস্থায় যখন সরে আসার কথা ওঠে তখন তারা সে ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে বিবেচনা করা সত্ত্বেও ঘাঁটি ধরে রাখে।

অভ্যুত্থান যখন তার সর্বোচ্চ সীমায় তখন প্রথম দরকার ছিল উত্তর ভারতে একটা ভ্রাম্যমাণ সৈন্যদল। এ কাজে যোগানো যেতে পারত কেবল দুটি বাহিনীকে — হ্যাভলকের ছোট্ট সৈন্যদল, যা অচিরেই অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয় এবং দিল্লির সম্মুখস্থ শক্তিকে। এই পরিস্থিতিতে অনাক্রম্য এক শক্তির সঙ্গে নিষ্ফল লড়াইয়ে হাতের শক্তি ক্ষয় করে দিল্লির সামনে বসে থাকা যে একটা সামরিক ভুল, একটা চলন্ত সৈন্যদলের মূল্য যে তার বসে থাকাকালীন মূল্যের চতুর্গুণ, দিল্লিকে ছেড়ে দিয়ে উত্তর ভারত নিষ্কৃক, যোগাযোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ও শক্তি সংহতির জন্য অভ্যুত্থানীদের সর্ব প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ করা যেতে পারত এবং সেই সঙ্গে একটা স্বাভাবিক ও সহজ পরিণতি হিসাবে পতন ঘটতে পারত দিল্লির, — তা অবিসংবাদিত তথ্য। কিন্তু রাজনৈতিক যুক্তির নির্দেশ হল, দিল্লির সামনে থেকে শিবির তোলা হবে না। দোষ দিতে হয় হেড-কোয়ার্টারের পণ্ডিতমূর্খদের, যারা সৈন্যদলকে পাঠায় দিল্লিতে — একবার সেখানে যাবার পর রুখে থাকায় সৈন্যবাহিনীর যে অধ্যবসায়, সেটা দোষণীয় নয়। সেই সঙ্গে এ কথার অনুল্লেখ অনুচিত যে, এ সৈন্যবাহিনীর ওপর বর্ষাকালের

যে প্রভাব দেখা যার সেটা প্রত্যাশিতের চেয়ে অনেক কম, এবং বছরের এই সময়টা সক্রিয় যুদ্ধকর্মের ফলে গড়পড়তায় যে ধরনের রোগ হওয়ার কথা, তার অনুরূপ কিছু ঘটলে সৈন্যদলের পশ্চাদপসরণ নতুবা ভাঙন হত অপরিহার্য। এ সৈন্যদলের বিপজ্জনক অবস্থাটা চলে আগস্ট মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত। অতিরিক্ত সৈন্য আসতে শুরু করল, আর বিদ্রোহী শিবির দুর্বল হয়ে চলল বিভেদের ফলে। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় দখলি ট্রেনটা পৌঁছয়, আত্মরক্ষামূলক অবস্থাটা বদলে যায় আক্রমণমূলক অবস্থায়। ৭ সেপ্টেম্বর প্রথম ব্যাটারি গোলা দাগতে শুরু করে এবং ১৩ সন্ধ্যায় দুটি কার্যকরী ভাঙন উন্মুক্ত হয়। এবার দেখা যাক মাঝখানের সময়টুকুতে কী ঘটেছিল।

এর জন্য জেনারেল ইউলসনের সরকারি ডিসপ্যাচে নির্ভর করতে হলে ভারি কাহিল অবস্থায় পড়তে হবে। ক্রিমিয়ায় ইংরেজ হেড-কোয়ার্টার থেকে প্রচারিত দলিলগুলি যতটা গোলমেলে হতে পেরেছিল এ রিপোর্টও ঠিক তেমনি। এ রিপোর্ট থেকে দুটি ভাঙনের অবস্থান কিংবা আক্রমণকারী বাহিনী দুটিকে বিন্যাসের আপেক্ষিক অবস্থান ও পর্যায় বোঝার সাধ্য কোনো জীবন্ত মানুষের নেই। আর ব্যক্তিগত রিপোর্ট, সেগুলি তো স্বভাবতই আরো বেদম রকমের গোলমেলে। সৌভাগ্যবশত ও সাফল্যের প্রায় সমগ্র কৃতিত্বটাই যাদের প্রাপ্য, সেই কুশলী বৈজ্ঞানিক অফিসারদের একজন, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স ও আর্টিলারির একজন সদস্য ৯প্র ৱ্ধ্নঁজ্জ ল্মঙ্গুপ্রস্স্প্র-এ (৭৩) ঘটনার একটি বিবরণ দিয়েছেন, এটি যেমন পরিষ্কার ও কার্যকরী তেমনি সরল ও অকপট। গোটা ক্রিমীয় যুদ্ধের মধ্যে এমন একজনও ইংরেজ অফিসার পাওয়া যায়নি যে এমন বিবেচক রিপোর্ট লিখতে পেরেছিল। দুর্ভাগ্যবশত ইনি আক্রমণের প্রথম দিনই আহত হন এবং তার পরের কোনো খবর তাঁর রিপোর্টে নেই। পরের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে তাই আমরা এখনো অন্ধকারে।

ইংরেজরা দিল্লির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যতটা জোরাল করেছিল সেটা একটা এশীয় সৈন্যবাহিনীর অবরোধ প্রতিরোধ করার মতো। আধুনিক ধারণায় দিল্লিকে দুর্গ বলা চলে না, সেটা হল স্থুল সৈন্যের জবরদস্তি হামলার বিরুদ্ধে একটা সুরক্ষিত জায়গা মাত্র। এর পাথরের দেওয়াল ১৬ ফিট উঁচু এবং ১২ ফিট চওড়া, তার ওপর ৩ ফিট চওড়া ও ৮ ফিট উঁচু একটা প্যারাপেট, দেওয়ালে প্যারাপেট ছাড়া ৬ ফিট পাথরের গাঁথনি ছিল যা ঢালু দিয়ে আটকানো নয়, এবং আক্রমণের সরাসরি গোলাবর্ষণের পক্ষে উন্মুক্ত। পাথরের দেওয়ালের সংকীর্ণতার জন্য ঘাঁটি ও মার্তেল্লো মিনারগুলো ছাড়া অন্য কোথাও কামান বসানো প্রশ্নের অতীত। ঘাঁটি ও মার্তেল্লো মিনারগুলো সংযোগ দেওয়ালকে পাশ থেকে আটকাতে পারে খুবই অপর্যাপ্তভাবে, এবং তিন ফিট চওড়া পাথরের প্যারাপেটকে দখলি কামান দিয়ে (ফিল্ড গান দিয়েও তা চলত) সহজে ভেঙে ফেলায় প্রতিরক্ষার অগ্নিবর্ষণকে, বিশেষ করে পরিখার পার্শ্বভাগ রক্ষাকারী কামানগুলিকে স্তব্ধ করা খুবই সহজ ছিল। দেওয়াল ও পরিখার মধ্যে ছিল একটা চওড়া জায়গা বা সমান রাস্তা, এতে একটা কার্যকরী ভাঙন ঘটাবার সুবিধা হয় এবং এ অবস্থায় পরিখাটা তাতে নিপতিত কোনো সৈন্যবাহিনীর পক্ষে ৬ত্রপ্র-%=ত্র%প্র হওয়ার বদলে হয়ে দাঁড়ায় ঢালুর দিকে ধাবিত হতে গিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া সারিগুলিকে পুনর্বিন্যাসের মতো অবকাশ স্থল।

প্রথম শর্ত অর্থাৎ চারিদিক থেকে জায়গাটা ঘেরাও করার মতো সৈন্যবাহিনী থাকলেও রীতিমত পরিখা কেটে অবরোধের নিয়ম অনুসারে এ ধরনের একটা াজয়গার ওপর চড়াও হওয় হত পাগলামি। প্রতিরক্ষার অবস্থা, প্রতিরক্ষীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও তাদের ক্রমক্ষীয়মাণ মনোবলের ফলে যা অনুসৃত হয়েছে তা ছাড়া অন্য যে-কোনো আক্রমণ পদ্ধতিই হত একান্ত ভুল। এ পদ্ধতিটা সামরিক লোকেদের কাছে জবরদস্তি আক্রমণ (ন্স্নভ্রপ্র প্র ৫প্রে শ=ত্ত্রপ্র) নামে অতি পরিচিত। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা ছিল শুধু এই যে ভারী কামান ছাড়া খোলাখুলি আক্রমণ অসম্ভব, এবং গোলন্দাজ বাহিনী তার ত্বরিৎ ফয়সালা করে, সারাক্ষণ গোলাবর্ষণ চলে জায়গাটার ভেতর দিকে এবং যেই একটা কার্যকরী ভাঙন ঘটে অমনি সৈন্যদল আক্রমণে এগোয়।

আক্রান্ত ফ্রন্টটি হল উত্তরের ফ্রন্ট, ঠিক ইংরেজ শিবিরের সামনে। এ ফ্রন্টটিতে ছিল দুটি সংযোগ দেওয়াল ও তিনটি ঘাঁটি, তা কেন্দ্রীয় (কাশ্মীর) ঘাঁটির কাছে খানিকটা আভ্যন্তরীণ কোণ রচনা করে। কাশ্মীরী থেকে ওয়াটার ঘাঁটি এই পূর্বাবস্থানটা ক্ষুদ্রতম, কাশ্মীরী থেকে মোরী ঘাঁটি এই পশ্চিমী অবস্থান থেকে খানিকটা সামনে। কাশ্মীরী ও ওয়াটার ঘাঁটির সামনেকার জায়গাটা ছিল ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়ের জঙ্গল বাগান ও

ঘরবাড়ি ইত্যাদিতে ভরা — সিপাহীরা এগুলিকে সমতল করে রাখেনি এবং আক্রমণের পক্ষে তা আশ্রয়ের কাজ করে। (এই ঘটনাটা থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, ইংরেজরা যেওখানকার কামানের মুখেই অতো বারবার সিপাহীদের অনুসরণ করতে পেরেছিল তা সম্ভব হয় কীভাবে। এটা তখন অতি বীরোচিত কর্ম বলে ধরা হয়েছিল, কিন্তু যতক্ষণ এ আশ্রয় থাকছে ততক্ষণ সেটা আসলে খুবই কম বিপজ্জনক)। তাছাড় এ ফ্রন্টের ৪০০ কি ৫০০ গজ দূরে একট গভীর খাদ ছিল দেওয়াল বরাবর, ফলে আক্রমণের একটা স্বাভাবিক সমান্তরাল পাওয়া যায় তাতে। তাছাড়া নদীটা ইংরেজদের বাম ভাগকে চমৎকার ঠেকা দেওয়ার কাশ্মীরী ও ওয়াটার ঘাঁটির মাঝখানের ঈষৎ বাঁকটা অতি সঠিকভাবেই প্রধান আক্রমণ-স্থল বলে বাছাই করা হয়। পশ্চিমী সংযোগ দেওয়াল ও ঘাঁটিগুলোকেও একই সঙ্গে আক্রমণের ভান করা হয় ও এই চালটা এতই সফল হয় যে, সিপাহীদের প্রধান শক্তিটা পরিচালিত হয় এই দিকেই। কাবুল গেটের বাইরে উপকণ্ঠে একটা প্রবল সৈন্যদল তারা জড়ো করে ইংরেজদের দক্ষিণ ভাগটাকে বিপন্ন করার জন্য। এ চালটা একান্তই সঠিক ও কার্যকরী হত যদি মোরী ও কাশ্মীরী ঘাঁটির মাঝখানের সংযোগ দেওয়ালটাই হত সবচেয়ে বেশি বিপন্ন। পার্শ্বভাগ থেকে সিপাহীদের এই অবস্থানটা সক্রিয় প্রতিরক্ষার একটা উপায় হিসাবে চমৎকার হত, আক্রমণের প্রতিটি দল এগিয়ে গেলেই পার্শ্বভাগ থেকে সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু পূর্বদিকে কাশ্মীরী ও ওয়াটার ঘাঁটির মধ্যবর্তী দেওয়াল পর্যন্ত এ অবস্থানের কোনো প্রভাব পৌঁছতে পারে না, এবং এই ভাবে এ অবস্থান নেওয়ায় নির্ধারক ক্ষেত্রটি থেকে প্রতিরক্ষী সৈন্যদের সেরা অংশটা সরে যায়।

ব্যাটারিগুলির স্থান নির্ণয়, তদের বিন্যাস ও সশস্ত্রীকরণ এবং যেভাবে তাদের সরবরাহ চলে তা সর্বোচ্চ প্রশংসার যোগ্য। ইংরেজদের ছিল প্রায় ৫০টি কামান ও মর্টার, ভালো পাকা প্যারাপেটের পেছনে শক্তিশালী ব্যাটারিতে তা কেন্দ্রীভূত। সরকারি বিবৃতি অনুসারে, আক্রান্ত ফ্রন্টটিতে সিপাহীদের ছিল ৫৫টি কামান, কিন্তু তা ছিল ছোটো ছোটো ঘাঁটি ও মার্তেল্লো মিনারগুলোয় ছড়ানো, কেন্দ্রীভূত ক্রিয়াকলাপে অক্ষম এবং শোচনীয় রকমের তিন ফিট প্যারপেটে প্রায় অরক্ষিত বললেই হয়। সন্দেহ নেই যে প্রতিরক্ষীদের অগ্নিবর্ষণ স্তব্ধ করার পক্ষে ঘণ্টা দুয়েকই যথেষ্ট, আর তারপর করার মতো আর বিশেষ কিছুই বাকি থাকে না।

৮ তারিখে ১ নং ব্যাটারির ১০টি কামান গোলাবর্ষণ শুরু করে দেয় দেওয়াল থেকে ৭০০ গজ দূরে। রাত্রে পূর্বোক্ত খাদটাকে ট্রেঞ্চের মতো করে বানিয়ে নেওয়া হয়। ৯ তারিখে এ খাদের সামনেকার বন্ধুর জায়গাটা ও ঘরবাড়িগুলো বিনা প্রতিরোধে দখল করা হয়, এবং ১০ তারিখে ২ নং ব্যাটারির আটটি কামানের মুখ খোলা হয়। এ ব্যাটারিটা ছিল দেওয়াল থেকে ৫০০ কি ৬০০ গজ দূরে। ওয়াটার ঘাঁটি থেকে ২০০ গজ দূরে সেই একই বন্ধুর জমিতে অতি সুসাহসে ও সুকৌশলে স্থাপিত ৩ নং ব্যাটারি তার ছয়টি কামান থেকে অগ্নিবর্ষণ শুরু করে ১১ তারিখে, এদিকে ১০টি ভারি মর্টার থেকে গোলা দাগা হয় শহরের ওপর। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় খবর মেলে, ভাঙন দুটি — একটি কাশ্মীরী গেটের দক্ষিণ ভাগের দেওয়ালে এবং আর একটি ওয়াটার ঘাঁটির বামমুখে ও পার্শ্বে — আরোহণযোগ্য এবং চড়াও হবার হুকুম দেওয়া হয়। দুই বিপন্ন ঘাঁটির মাঝখানের ঢালুতে সিপাহীরা ১১ তারিখ একটা পাল্টা ট্রেঞ্চ কাটে ও ইংরেজ ব্যাটারিগুলির প্রায় সাড়ে তিন শ গজ সামনে এক ট্রেঞ্চ খোঁড়ে সংঘর্ষের জন্য। কাবুল গেটের বাইরেকার অবস্থান থেকেও তারা অগ্রসর হয় পার্শ্বভাগ আক্রমণের জন্য। কিন্তু সক্রিয় প্রতিরক্ষার এই প্রচেষ্টাগুলি চালানো হয় ঐক্য, যোগাযোগ ও প্রেরণা ছাড়াই এবং তাতে কোনো ফল হয় না।

১৪ তারিখ ভোরে পাঁচটি ব্রিটিশ বাহিনী আক্রমণে এগোয়। একটি দক্ষিণ দিকে, কাবুল গেটের বাইরেকার সৈন্যদলকে ব্যস্ত রাখতে এবং সফল হলে লাহোর গেটের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য। এক একটি ভাঙনের জন্য এক একটি বাহিনী, একটি বাহিনী কাশ্মীরী গেটের বিরুদ্ধে, যা উড়িয়ে দেওয়ার কথা এবং একটি রইল রিজার্ভ হিসাবে। প্রথম বাহিনীটা ছাড়া এই সবকটি বাহিনীই সফল হয়। ভাঙনগুলিতে সামান্যই লড়াই হয়, কিন্তু দেওয়ালের কাছাকাছি ঘরবাড়িগুলিতে প্রতিরোধ হয় মরীয়া। ইঞ্জিনিয়রদের একজন অফিসার ও তিনজন সার্জেন্টের বীরত্বে (কেননা এ ক্ষেত্রে সত্যই বীরত্ব ছিল) কাশ্মীরী গেটকে উন্মুক্ত করা হয় উড়িয়ে দিয়ে এবং এইভাবে এ বাহিনীটিও শহরে ঢোকে। সন্ধ্যা নাগাদ সমস্ত উত্তর ফ্রন্ট ইংরেজদের দখলে

চলে যায়। এইখানে কিন্তু জেনারেল উইলসন থামেন। নির্বিচার আক্রমণ আটকানো হয়, কামানগুলিকে নিয়ে আসা হয় ও তা চালানো হয় শহরের প্রতিটি সুরক্ষিত জায়গার দিকে। অস্ত্রাগার চড়াও-দখল ছাড়া আসল লড়াই খুব কমই হয়েছে বলে মনে হয়। অভ্যুত্থানীরা হতোদ্যম হয়ে ছিল, দলে দলে শহর ছেড়ে যায় তারা। শহরের ভেতর উইলসন সাবধানে এগোন, ১৭ তারিখের পরে কোনো প্রতিরোধ পান না বললেই হয় এবং ২০ তারিখে তা পুরোপুরি দখল করেন।

আক্রমণের ধারা বিষয়ে আমাদের মত দিয়েছি। আর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে — আক্রমণাত্মক পাল্টা গতিবিধির চেষ্টা, কাবুল গেটের কাছে পার্শ্বভাগ বিপন্ন করার মতো অবস্থান, পাল্টা ট্রেঞ্চ, রাইফেল পিট, এ সবকিছু থেকে দেখা যায়, সিপাহীদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের বৈজ্ঞানিক কিছুটা ধারণা পৌঁছিয়েছে, কিন্তু সে ধারণা যে খানিকটা সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী হবে, এতটা পরিষ্কার বা এতটা জোরালো তা নয়। এ ধারণার উৎস ভারতীয়দের মধ্যে, নাকি তাদের সঙ্গে যেসব ইউরোপীয় আছে তাদের কারো কাছ থেকে — তা স্থির করা অবশ্যই কঠিন, কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চিত, এ প্রচেষ্টাগুলিকে কাজে পরিণত করায় যতই খুঁত থাক, মূল পরিকল্পনায় সেভাস্তপলের সক্রিয় প্রতিরক্ষার সঙ্গে তার খুবই মিল আছে, এবং কাজে পরিণত করা দেখে মনে হয় যেন কোনো ইউরোপীয় অফিসার সিপাহীদের জন্য একটা পরিকল্পনা করে দেন, কিন্তু সিপাহীরা তা পুরো বুঝতে পারেনি, নয়ত বিশৃঙ্খলা ও অধিনায়কত্বের অভাবে কার্যকরী প্রকল্পগুলো পরিণত হয় দুর্বল ও অক্ষম প্রচেষ্টায়।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৫৭ সালের ১৬ নভেম্বর লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫১৮৮ নং সংখ্যায়
১৮৫৭ সালের ৫ ডিসেম্বর প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

* পরিবার কর্তা — সম্পাঃ।
* খাদ কাটা ফাঁদ — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

আসন্ন ভারতীয় ঋণ

লন্ডন, ২২ জানুয়ারি, ১৮৫৮

সাধারণ উৎপাদনী লগ্নি থেকে প্রভূত পরিমাণ পুঁজি তুলে নিয়ে সিকিউরিটি বাজারে তা ঢালায় লন্ডনের টাকার বাজারে যে স্ফূর্তি দেখা দিয়েছিল, তা আশী লক্ষ কি এক কোটি পাউন্ড স্টার্লিঙের একটা আসন্ন ভারতীয় ঋণের সম্ভাবনায় বিগত পক্ষকালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এ ঋণ তোলা হবে ইংলন্ডে, এবং ফেব্রুয়ারিতে পার্লামেন্ট বসার সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেন্ট তা অনুমোদন করবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর তার ইংলন্ডীয় উত্তমর্ণেরা যে সব দাবি ধরছে এবং ভারতীয় বিদ্রোহের ফলে যুদ্ধ সামগ্রী, মালপত্র, সৈন্য পরিবহন ইত্যাদিতে যে বাড়তি খরচ হয়েছে তা মেটাতে এ ঋণ দরকার। ১৮৫৭ সালের আগস্টে, পার্লামেন্ট অধিবেশন শেষ হবার আগে ব্রিটিশ সরকার সগাম্ভীর্যে কমন্স সভায় ঘোষণা করেছিল যে তেমন কোনো ঋণের অভিপ্রায় তাদের নেই। সংকট মেটাতে কোম্পানির আর্থিক অবস্থাই যথেষ্ট। জন বুলের ওপর চাপানো এই প্রীতিকর ধোঁকাটা কিন্তু অচিরেই কেটে যায়, যখন ফাঁস হল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় রেলপথ নির্মাণের জন্য তাদের ওপর ন্যস্ত বিভিন্ন কোম্পানির প্রায় ৩৫ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিঙের মতো টাকা গ্রাস করেছে অতি সন্দেহজনক এক উপায়ে, এবং তাছাড়া গোপনে ঋণ নিয়েছে ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের কাছ থেকে ১০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিঙ এবং আরো ১০ লক্ষ লন্ডন জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে। জনসাধারণ

এইভাবে সর্বমন্দ সংবাদের জন্য তৈরি হয়ে ওঠায় সরকার মুখোস ত্যাগে আর দ্বিধা করেনি, ৯প্র ৯ঁপ্রক্ষ্ণ ৯প্র লদ=প্র (৭৪) ও অন্যান্য সরকারি মুখপত্রে আধাসরকারি প্রবন্ধ মারফত ঋণের আবশ্যকতার কথ বলতে থাকে।

প্রশ্ন হতে পারে, এরূপ ঋণ চালু করার জন্য বিধানিক সংস্থার পক্ষ থেকে একটা বিশেষ অ্যাক্টের প্রয়োজন হল কেন এবং তাছাড়া, এরূপ ঘটনায় ন্যূনতম শঙ্কা সৃষ্টিই বা হচ্ছে কেন, বরং বিপরীতপক্ষে, বর্তমানে বৃথাই লাভজনক লগ্নির প্রত্যাশী ব্রিটিশ পুঁজির প্রত্যেকটা উন্মুক্তিকেই উপস্থিত পরিস্থিতিতে আচমকা সৌভাগ্য ও পুঁজির দ্রুত মূল্যহ্রাসের বিরুদ্ধে অতি কল্যাণকর প্রতিবন্ধ রূপে গণ করা উচিত।

সকলেই জানেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক সত্তার অবসান হয় ১৮৩৪ সালে (৭৫), যখন তার বাণিজ্যিক মুনাফার শেষ প্রধান উৎস চিনা বাণিজ্যের একচেটিয়া ছিন্ন হয়। সুতরাং, কোম্পানির বাণিজ্য-মুনাফা থেকে যারা, অন্তত বাহ্যত, তাদের ডিভিডেন্ট পাচ্ছিল সেই ইস্ট ইন্ডিয়া স্টক হোল্ডারদের জন্য একটা নতুন আর্থিক বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয়। তখনো পর্যন্ত কোম্পানির বাণিজ্য-আয় থেকে যে ডিভিডেন্ট আদায় যোগ্য তা সরানো হল তার রাজনৈতিক রাজস্বের ওপর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার সরকারি অধিকারে যে রাজস্ব পাবে, তাই থেকে ইস্ট ইন্ডয়া স্টকের স্বত্বাধিকারীদের টাকা দেবার কথা থাকে এবং পার্লামেন্টের এক অ্যাক্ট-এ দশ শতকরা সুদের ৬০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিঙ ভারতীয় স্টক পরিণত হল এমন একটা পুঁজিতে, যা স্টকের প্রতি একশ পাউন্ড বাবদ দুশ পাউন্ড না দিয়ে কারবার গুটান যাবে না। অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকের মূল ৬০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিঙ পরিণত হল ১ কোটি ২০ লক্ষ স্টার্লিঙের এক পুঁজিতে, যার সুদের হার শতকরা পাঁচ এবং তা আদায় হবে ভারতীয় জনগণের ট্যাক্স বাবদ রাজস্ব থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঋণ এইভাবে পার্লামেন্টী হাত সাফাইয়ে পরিণত হল ভারতীয় জনগণের ঋণে। এছাড়াও আছে ৫ কোটি পাউন্ড স্টার্লিঙের একটা ঋণ, এ ঋণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তোলে ভারতে এবং তা সম্পূর্ণই সে-দেশের রাষ্ট্রীয় আয় থেকে পরিশোধ্য, খাস ভারতে কোম্পানি এই ধরনের যে ঋণ করে তা সর্বদাই গণ্য করা হয়েছে পার্লামেন্টী বিধান এক্তিয়ারের বাইরে এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশিক সরকারগুলি যেসব ঋণ করে তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

অন্যপক্ষে, পার্লামেন্টের বিশেষ মঞ্জুরি ছাড়া খাস গ্রেট বৃটেনে সুদবহ ঋণ গ্রহণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিষিদ্ধ হয়। কয়েক বছর আগে ভারতে রেলপথ ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকালে কোম্পানি লন্ডন বাজারে ভারতীয় বন্ড ছাড়ার অনুমোদন চায় — এ অনুরোধ মঞ্জুর হয় ৭০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিঙ পরিমাণ পর্যন্ত, তা ছাড়া হবে শতকরা ৪ পাউন্ড সুদবহ বন্ডে, যার সিকিউরিটি হবে কেবল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আয়। ভারতে বিদ্রোহ শুরুর সময় এই বন্ড-ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৮,৯৪,৪০০ পাউন্ড স্টার্লিঙ, পার্লামেন্টে ফের আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংলন্ডে ঋণগ্রহণের আইনসঙ্গত অধিকার ভারতীয় অভ্যুত্থানের ভেতরে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এখন এ কথা গোপন নয় যে এ ব্যবস্থা নেবার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় একটা ঋণ চলু করে, যা কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। এতে একদিকে প্রমাণ হচ্ছে যে লন্ডন প্রেসের যা বৈশিষ্ট্য সেই রকম একটা নিশ্চিত উৎসাহে ভারতে ব্রিটিশ প্রধান্যের সম্ভাবনার কথা ভারতীয় পুঁজিপতিরা বিশেষ ভাবছেন না, এবং অন্যপক্ষে, এক অসাধারণ মাত্রায় চড়ে যাচ্ছে জন বুলের রাগ, কারণ ভারতে গত সাত বছরে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি মজুদ হয়েছে তা সে জাতে, যেখানে সম্প্রতি মেসার্স হ্যাগার্ড লন্ডন বন্দর থেকেই ২,১০,০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের বুলিয়ন চালান গেছে। ৯প্র=ঁ=ঁ ৯ঁপ্রক্ষ্ণ খুব একটা বোঝাবার সুরে তা পাঠকদের জানিয়েছে যে,

‘দেশীয়দের বিশ্বস্ততা জাগাবার সমস্ত প্রেরণার মধ্যে সবচেয়ে সন্দেহাতীত হল তাদের আমাদের উত্তমর্ণ করে তোলা, আর অন্যপক্ষে, অন্য দেশের ধনী দাবিদারদের কাছে ডিভিডেন্ট পাঠাবার জন্য বছরে বছরে ট্যাক্স চাপছে এই ধারণা থেকে যে অসন্তোষ বা বিশ্বাসঘাতকতার প্রলোভন সৃষ্টি হয়, আবেগপ্রবণ, গোপন-প্রকৃতি ও লোলুপ একটা জাতির পক্ষে তার চেয়ে প্রবল প্রলোভন আর কিছু নেই।’

ভারতীয়রা কিন্তু যেন বুঝছে না এ পরিকল্পনার চমৎকারিত্ব — যাতে ভারতীয় পুঁজির বিনিময়ে ইংরেজ প্রভুত্বই শুধু পুনঃস্থাপিত হবে না, সেই সঙ্গো ঘুর পথে দেশীয় মজুত তহবিলগুলোও উন্মুক্ত হবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের কাছে। প্রতিটি খাঁটি ইংরেজ বেদবাক্যজ্ঞানে যতটা দাবি করে, ভারতীয় পুঁজিপতিরা যদি ব্রিটিশ শাসনের ততটা ভক্ত হত, তাহলে রাজভক্তি প্রদশলন ও স্বীয় রৌপ্য পরিহারের এত বড়ো সুযোগ তারা আর পেত না। কিন্তু ভারতীয় পুঁজিপতিরা তাদের মজুত টাকা না ছাড়ায় অন্তত, সর্বাগ্রে দেশীয়দের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা বিনাই, ভারতীয় অভ্যুত্থানের খরচ নিজেকেই পরিশোধের একান্ত আবশ্যকতা বিষয়ে মন ঠিক করতে হবে জন বুলকে। আসন্ন ঋণট তদুপরি একটা পূর্বাভাস মাত্র, দেখাচ্ছে যেন ‘ইঙ্গ-ভারতীয় হোম ঋণ’ নামক একটি বইয়ের প্রথম পাতা। এ কথা গোপন নয় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যা প্রয়োজন সেটা াশি লক্ষ কি এক কোটি নয়, আড়াই থেকে তিন কোটি পাউন্ড, তাও প্রথম কিস্তি হিসাবে, ভবিষ্যতে যা ব্যয় হবে তার জন্য নয়, আগেই যে দেনা হয়ে আছে তার জন্য। গত তিন বছরে ঘাটতি আয়ের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ পাউন্ড, গত ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত অভ্যুত্থানীরা যে ধনসম্পদ লুঠ করেছে তার পরিমাণ, ভারতীয় সরকারি পত্র The Phoenix-এর (৭৬) বিবৃতি অনুযায়ী ১,০০,০০,০০০ পাউন্ড, উত্তর-পূর্ব প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহজনিত রাজস্ব লোকসান ৫০,০০,০০০ পাউন্ড আর যুদ্ধ-খরচা অন্তত ১,০০,০০,০০০ পাউন্ড।

এ কথা সত্যি যে লন্ডনের টাকার বাজারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পর পর ঋণগ্রহণে টাকার দাম বাড়বে ও পুঁজির ক্রমবর্ধমান মূল্যহ্রাস বন্ধ হবে, অর্থাৎ বন্ধ হবে সুদের হারের ক্রমাবনতি, কিন্তু ব্রিশি শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য ঠিক ওই অবনতিটাই দরকার। ডিসকাউন্টের হারের নিম্নগতিতে কোনো কৃত্রিম প্রতিবন্ধ হল উৎপাদন খরচা ও ঋণ শর্ত বৃদ্ধির সমতুল্য, বর্তমানের কাহিল অবস্থায় ইংরেজ বাণিজ্য তা বহনে সমর্থ বলে বোধ করে না। এই কারণেই ভারতীয় ঋণ ঘোষণায় সাধারণভাবে ক্রন্দনধ্বনি উঠেছে। পার্লামেন্টী অনুমোদনে কোম্পানির ঋণে কোনো রাজকীয় গ্যারন্টি যুক্ত হচ্ছে না বটে, কিন্তু আর কোনো শর্তে টাকা না উঠলে সে গ্যারান্টিও দিতে হবে, আর সব কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থলাভিষিক্ত হওয়া মাত্রই কোম্পানির ঋণ মিলে যাবে ব্রিটিশ ঋণে। সুতরাং মনে হয় ভারতীয় বিদ্রোহের একটা প্রথম আর্থিক ফল হবে বৃহৎ জাতীয় ঋণের অধিকতর বৃদ্ধি।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৮ সালের ২২ জানুয়ারি লিখিত
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫২৪৩ নং সংখ্যায়
১৮৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

উইন্ডহ্যামের পরাজয় (৭৭)

ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় সারা ইংলন্ড যখন তার সৈন্যদল সংগঠনে ও পরিচালনে সমর্থ এমন কারোর দাবি করছিল এবং রেগলেন, সিম্পসন ও কডরিংটনের মতো অকর্মণ্যেরা যখন পদাধিকারী, তখন ক্রিমিয়ায় এমন একজন সৈনিক ছিলেন, যাঁর মধ্যে সেনাপতির সব গুণ বর্তমান। আমরা স্যার কলিন ক্যামবেলের কথা বলছি, ভারতে ইনি এখন প্রতিদিন দেখিয়ে দিচ্ছেন যে নিজের কাজটা ইনি ওস্তাদের মতোই বোঝেন। আলমায়-য় (৭৮) ব্রিটিশ আর্মির অনড় লাইন-কৌশলের ফলে তিনি তাঁর সামর্থ্য দেখাবার সুযোগ পাননি এবং আলমায় ব্রিগেড পরিচালনা করতে দেওয়ার পর ক্রিমিয়ায় তাঁকে বালাক্লাভায় সেঁধিয়ে রাখা হয় ও একবারও পরের যুদ্ধকর্মগুলিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। অথচ তাঁর সামরিক মেধার কথা বহু আগেই ভারতে পরিষ্কার করে বলে যান আর কেউ নয়, মার্লবরোর পরে ইংলন্ড যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতির জন্ম দিয়েছে তেমন একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি, স্যার চার্লস জেমস নেপিয়ার। কিন্তু নেপিয়ার ছিলেন স্বাধীনচেতা পুরুষ, শাসক

চক্রতন্ত্রের কাছে মাথা নোয়াতে তাঁর অহঙ্কারে বাধত — তাই ক্যামবেলকে চিহ্নিত ও অবিশ্বাস্য করে তোলার পক্ষে তাঁর সুপারিশই ছিল যথেষ্ট।

সে যুদ্ধে অন্য লোকেরাই কিন্তু সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। ছিলেন কার্সের স্যার উইলিয়ম ফেনউইক উইলিয়মস, ঔদ্ধত্যে, আত্মপ্রচারে ও জেনারেল ক্মেতির যথার্থ খ্যাতি চুরির ফলে অর্জিত তাঁর জয়মাল্য নিয়ে বসে থাকাই তিনি এখন সুবিধাজনক বলে দেখছেন। একটি ব্যারন উপাধি, বছরে হাজার পাউন্ড, উলউইচে একটি মোটা চাকুরি এবং পার্লামেন্টে একটি আসন — ভারতে তাঁর খ্যাতি বিপন্ন করার ঝুঁকি না নিতে এই-ই যথেষ্ট। 'রেদানের বীর' (৭৯) জেনারেল উইন্ডহ্যাম কিন্তু তাঁর পথ না নিয়ে সিপাহীদের বিরুদ্ধে একটি ডিভিসনের সেনাপত্য গ্রহণ করতে যান এবং এই প্রথম কর্মটিতেই চিরকালের মতো তাঁর ফয়সালা হয়ে গেছে। উচ্চ বংশ সম্পর্কের এই অজ্ঞাত কর্ণেলটি রেদানের আক্রমণে একটি ব্রিগেড পরিচালনা করেন, এ আক্রমণ কালে অত্যন্ত নিরুদ্যোগীর মতো ব্যবহার করেন তিনি, এবং অবশেষে কোনো সৈন্যসাহায্য না আসায় দুবার নিজের সৈন্যদের স্বীয় ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজেই চলে যান খোঁজ নিতে। প্রশ্নসাপেক্ষ এই যে-কাজের জন্য অন্য সার্বিসে কোর্টমার্শালে তদন্ত হত, তাতে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল করে দেওয়া হয় ও কিছু পরে তাঁর ডাক পড়ে চিফ অব স্টাফ পদের জন্য।

কলিন ক্যামবেল যখন লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হন তখন তিনি পুরনো ঘাঁটি, শিবির এবং গঙ্গার ওপরকার ব্রিজ সহ কানপুর শহর দিয়ে যান জেনারেল উইন্ডহ্যামের দায়িত্বে এবং সে কাজের পক্ষে যথেষ্ট একদল সৈন্য রেখে যান। পুরোপুরি অথবা অংশত পাঁচ রেজিমেন্টের পদাতিক ছিল সেখানে, ঘাঁটি গাড়া বহু কামান, ১০টি ফিল্ড গান, দুটি নৌ-কামান এবং ১০০টি ঘোড়া, সমগ্র সৈন্যের সংখ্যা ২,০০০-এর ওপর। ক্যামবেল যখন লক্ষ্ণৌতে ব্যাপৃত, তখন দোয়াব অঞ্চলে ভ্রাম্যমান বিভিন্ন বিদ্রোহী দল কানপুর আক্রমণের জন্য একত্র হয়। বিদ্রোহী জমিদারদের দ্বারা সংগৃহীত পাঁচমিশেলী দঙ্গল ছাড়া কুচকাওয়াজ করা সৈন্য বলতে (সুশৃঙ্খল তাদের বলা যাবে না) আক্রমণকারী দলের মধ্যে ছিল, দানাপুর সিপাহীদের অবশিষ্টাংশ এবং গোয়ালিয়র বাহিনীর একটা ভাগ। এই শেষের বাহিনীটাই হল একমাত্র অভ্যুত্থানী সৈন্যদল যাদের সংগঠন কোম্পানি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধরা যায়, কারণ এদের অফিসাররা ছিল প্রায় পুরোপুরিই দেশীয় এবং এইভাবে ফিল্ড অফিসার ও ক্যাপ্টেন সহ সংগঠিত ব্যাটালিয়নের খানিকটা চরিত্র তাদের বজায় ছিল। সুতরাং ব্রিটিশেরা তাদের খানিকটা সম্মান করে চলত। আত্মরক্ষার অবস্থানে থাকার কড়া আদেশ পেয়েছিলেন উইন্ডহ্যাম, কিন্তু যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ায় ক্যামবেলের কাছ থেকে তাঁর ডিসপ্যাচের কোনো জবাব না পেয়ে তিনি নিজ দায়িত্বে কাজ করার সংকল্প করেন। ২৬ নভেম্বর ১,২০০ পদাতিক, ১০০ ঘোড়া ও ৮টি কামান নিয়ে তিনি আগুয়ান অভ্যুত্থানীদের সম্মুখীন হতে যান। তাদের অগ্রবাহিনীটাকে সহজেই পরাস্ত করার পর তিনি দেখেন যে প্রধান বাহিনীটা আসছে, তখন তিনি কানপুরের কাছাকাছি সরে আসেন। এখানে তিনি শহরের সামনে একটা অবস্থিতি নেন, তাঁর বাঁয়ে থাকে ৩৪ নং রেজিমেন্ট এবং ডানে রাইফেল বাহিনী (৫টি কোম্পানি) ও ৮২ নম্বরের দুটি কোম্পানি। পশ্চাদপসরণের পথ থাকে শহরের মধ্য দিয়ে, বাঁয়ের পেছন দিকে ছিল কিছু ইঁটখোলা। ফ্রন্ট থেকে চার শ গজের মধ্যে এবং দুই পার্শ্বভাগের দিকে আরো কাছের নানা জায়গায় ছিল গাছপালা বনজঙ্গল, আগুয়ান শত্রুর পক্ষে তাতে চমৎকার আশ্রয়ের কাজ হয়। বস্তুতপক্ষে, এর চেয়ে খারাপ অবস্থান আর বাছাই করা সম্ভব নয় — খোলা মাঠের মধ্যে ব্রিটিশেরা উন্মুক্ত আর ভারতীয়রা আড়াল নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে একেবারে তিন শ কি চার শ গজের মধ্যে! উইন্ডহ্যামের 'বীরত্ব' আরো একটু চড়া রঙে দেখাবার জন্য বলি, কাছেই একটা বেশ চমৎকার অবস্থান ছিল, তার সামনে পেছনে সমতল এবং ফ্রন্টের সামনে প্রতিবন্ধক হিসাবে একটা খাল, কিন্তু অবশ্যই খারাপ অবস্থানটার জন্যই জিদ করা হয়। ২৭ নভেম্বর শত্রুপক্ষ কামান চালাতে শুরু করে, জঙ্গলের আড়ালে কামানগুলোকে নিয়ে আসে একেবারে ধার পর্যন্ত। বীরশোভন বিনয়ে উইন্ডহ্যাম একে বলেন 'গোলাবর্ষণ' এবং জানান যে, তাঁর সৈন্যরা পাঁচ ঘণ্টা ধরে তা সহ্য করে, কিন্তু এর পর এমন একটা ব্যাপার ঘটে যা উইন্ডহ্যাম বা উপস্থিত কোনো ব্যক্তি বা কোনো ভারতীয় কি ব্রিটিশ সংবাদপত্র বলতে সাহস করেনি। কামানবাজি যেই লড়াইয়ে পরিণত হয় অমনি আমাদের সংবাদের

সমস্ত প্রত্যক্ষ সূত্র বন্ধ হয়ে যায় এবং হাতের কাছে যে দ্বিধাগ্রস্ত, এড়িয়ে যাওয়া ও অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য রয়েছে তাই থেকেই আমাদের সিদ্ধান্ত টানতে হবে। উইন্ডহ্যাম শুধু এই নিম্নোক্ত অসংলগ্ন বিবৃতিটা ছাড়া আর কিছু জানাননি :

'শত্রুর প্রবল গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও আমার সৈন্যরা পাঁচ ঘণ্টা ধরে আক্রমণ' (ফিলন্ড সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটা কামানবাজিকে আক্রমণ বলা সত্যিই অভিনব) 'প্রতিরোধ করে ও তখনো মাটি ধরে থাকে। শেষ পর্যন্ত, ৮৮ নম্বরের বেঅনেটে বিদ্ধ লোকেদের সংখ্যা থেকে বুঝলাম যে বিদ্রোহীরা পুরোপুরি শহরে প্রবেশ করেছে, তারা কেল্লা আক্রমণ করছে, এই কথা শুনে আমি জেনারেল দ্যুপ্যুইকে পিছু হটার নির্দেশ দিই। সমস্ত রসদপত্র ও কামানাদি নিয়ে আমাদের সমস্ত সৈন্য কেল্লায় ফিরে আসে অন্ধকার হবার কিছু আগে। ছাউনির লস্কররা পালিয়ে যাওয়ায় আমি আমার শিবিরের সাজসরঞ্জাম ও কিছু মোটঘাট আনতে পারিনি। আমার একটা নির্দেশ পরিজ্ঞাপনে গলতি না হলে আমার অভিমত, আমি রুখে থাকতে পারতাম, অন্তত অন্ধকার পর্যন্ত।'

রেদানে ইতিপূর্বেই যা দেখিয়েছেন সেই সহজাতবেধে জেনারেল উইন্ডহ্যাম সরে আসেন মজুতের কাছে (সিদ্ধান্ত করতে হয়, শহর দখলে-রাখা ৮৮ নং) এবং জীবন্ত শত্রু বা লড়াই নয়, দেখেন ৮৮ নম্বরের বেঅনেটে বিদ্ধ প্রচুর সংখ্যক শত্রু। এ থেকে সিদ্ধান্ত হয় শত্রু (মৃত কি জীবন্ত তা তিনি বলছেন না) পুরোপুরি শহরে ঢুকে পড়েছে! এ সিদ্ধান্ত পাঠক ও তাঁর পক্ষে আতঙ্কজনক হলেও বীরপুঙ্গব এখানেই থামছেন না। তিনি শুনলেন কেল্লা আক্রান্ত হয়েছে। একজন সাধারণ সেনাপতি এ কাহিনীর সত্যতা যাচাই করতেন, যা স্বভাবতই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু উইন্ডহ্যাম তেমন লোক নন। তিনি পিছু হটার হুকুম দেন, যদিও তাঁর সৈন্যরা উইন্ডহ্যামের একটা নির্দেশ পরিজ্ঞাপনে গলতি না হলে অন্ধকার পর্যন্ত রুখে থাকতে পারত! অর্থাৎ প্রথমে পাওয়া গেল উইন্ডহ্যামের এই বীরোচিত সিদ্ধান্ত যে যেখানে অনেক মৃত সিপাহী আছে সেখানে অনেক জীবন্ত সিপাহীও থাকবেই, দ্বিতীয়, কেল্লা আক্রমণ বিষয় ভুয়া হুঁশিয়ারি, তৃতীয়ত, একটা নির্দেশ পরিজ্ঞাপনে গলতি, এই সবকিছু দুর্ঘটনা যোগে রেদানের বীরকে পরাস্ত করা ও তাঁর সৈন্যদের অদম্য ব্রিটিশ সাহসকে দমানো সম্ভব হয় দেশীয়দের এক অসংখ্য দঙ্গলের পক্ষে।

আর একজন রিপোর্টার — ঘটনাস্থলের একজন অফিসার বলছেন :

'আমার মনে হয় না কেউ এ দিন পূর্বাহ্নের লড়াই ও পশ্চাদপসরণ সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে। পশ্চাদপসরণের হুকুম হল। মহারানির ৩৪ নং পদাতিকের ওপর নির্দেশ এল ইঁটখোলার পেছনে সরে আসতে, কিন্তু সেটা যে কোথায় তা অফিসার বা সৈন্যরা কেউই জানত না! সৈন্যাবাসে দ্রুত এ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, আমাদের সৈন্যরা পরাজিত হয়েছে ও পিছু হটছে, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরকার গরখাইগুলোর দিকে যাবার জন্য বিপুল হুড়োহুড়ি লেগে যায়, নায়েগ্রা প্রপাতের জলের মতোই তা দুর্নিবার। বেলা দুটো থেকে সৈন্য ও পল্টন, ইউরোপীয় ও দেশীয়, পুরুষ নারী ও শিশু, ঘোড়া উট ও বলদ অসংখ্য গিয়ে জুটতে থাকে। রাত নাগাদ মানুষ ও পশু, মোটঘাট ও যতরকমের অকথ্য বোঝায় মিলে ঘাঁটি গাড়া শিবিরটায় যা শুরু হয় সেটা শুধু সৃষ্টির নির্দেশ আসার আগেকার বিশৃঙ্খলার সঙ্গে তুলনীয়।'

পরিশেষে, The Times-এর কলকাতাস্থ সংবাদদাতা বলছেন যে, স্পষ্টতই ২৭ তারিখে ব্রিটিশদের যা ঘটে 'সেটা প্রায় প্রতিহত হওয়াই দাঁড়ায়', কিন্তু ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র দেশপ্রেমিক অভিসন্ধি থেকে এ লজ্জাকে মার্জনার দুর্ভেদ্য আবরণে ঢাকছে। এইটুকুও অবশ্য স্বীকার করা হচ্ছে যে, প্রধানত রিক্রুট নিয়ে গড়ে তোলা মহারানির একটা রেজিমেন্ট একসময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, তবে পিছু হটেনি এবং কেল্লায় গণ্ডগোল ওঠে চরমে, উইন্ডহ্যাম তাঁর সৈন্যদের ওপরসমস্ত দখল হারিয়ে ফেলেন এবং অবশেষে ২৮ সন্ধ্যায় ক্যামবেল পৌঁছান ও 'কিছু কড়া কথায়' ফেরে সবাইকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনেন।

এখন এইসব গোলমেলে ও এড়িয়ে যাওয়া বিবৃতি থেকে স্পষ্টতই কী সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়? শুধু এই সিদ্ধান্ত যে, উইন্ডহ্যামের অক্ষম পরিচালনায় ব্রিটিশ সৈন্যরা একান্তই অকারণে পরিপূর্ণ পরাজিত হয়, ৩৪ নং রেজিমেন্টের অফিসাররা লড়বার জায়গাটার সঙ্গে এতটুকু পরিচিত হবার কষ্ট করেনি এবং পশ্চাদপসরণের যখন হুকুম হল তখন তারা যেখানে সরে যেতে হবে সে জায়গাটাই খুঁজে পায়নি, রেজিমেন্ট বিশৃঙ্খল হয়ে

পড়ে শেষ পর্যন্ত পালায়, এর ফলে শিবিরে একটা আতঙ্ক দেখা দেয়, তাতে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার সব সীমানা ভেঙে পড়ে এবং শিবিরের সাজসরঞ্জাম ও কিছুটা মালপত্র হাতছাড়া হয়, এবং শেষ পর্যন্ত রসদ সম্পর্কে উইন্ডহ্যামের উক্তি সত্ত্বেও, ১৫,০০০ মিনয়ে কার্তুজ, পে-মাস্টারের সিন্দুক এবং বহু রেজিমেন্ট ও রিক্রুটের জুতা ও পোষাপ পরিচ্ছদ শত্রুর হাতে পড়ে।

রণক্ষেত্রে বা সারিবন্দী হয়ে থাকার সময় ইংরেজ সৈন্য পলায়ন করে কদাচিত। রুশীদের মতোই তাদের একটা স্বাভাবিক সংহতি আছে, যেটা সাধারণত পুরনো সৈন্যদেরই থাকে, তার আংশিক ব্যাখ্যা এই যে উভয় সৈন্যদলেই প্রচুর পুরনো সৈন্য আছে, কিন্তু অংশত সেটা স্পষ্টতই তাদের জাতীয় চরিত্রের জন্য। এ গুণটার সঙ্গে ‘সাহসের’ কোনো সম্পর্ক নেই, বরং সহজাত আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিরই তা একটা বিশেষ প্রকাশ, তবু তা খুবই মূল্যবান, বিশেষ করে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে। ইংরেজদের নিরুদ্বিগ্ন প্রকৃতির সঙ্গে মিলে তাতে আতঙ্কও আটকায়, কিন্তু উল্লেখ করা দরকার যে, আইরিশ সৈন্যরা যদি একবার বিশৃঙ্খল হয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের ফের জমায়েত করা সহজ নয়। উইন্ডহ্যামের বেলায় এই ঘটেছিল ২৭ নভেম্বর। এর পর থেকে তাঁর নাম থাকবে সেই সব ইংরেজ জেনারেলের নাতিদীর্ঘ কিন্তু বিখ্যাত তালিকার মধ্যে যাঁরা তাঁদের সৈন্যদের আতঙ্কিত পলায়ন সম্ভব করেন।

২৮ তারিখে গোয়ালিয়র দলটা বিথুর থেকে আসা বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য পেয়ে ব্রিটিশদের গেড়ে বসা বহির্ঘাটির চার শ গজের মধ্যে কাছিয়ে আসে। আর একটা লড়াই হয়, সেটা আক্রমণকারীরা খুব জোরে চালায় না। তার মধ্যে ৬৪ নম্বরের সৈন্য ও অফিসারদের পক্ষ থেকে সত্যিকার সাহসের একটা দৃষ্টান্ত ঘটে, সানন্দে তা আমরা উল্লেখ করব, যদিও কীর্তিটা এমনিতে সুবিখ্যাত বালাক্লাভা আক্রমণের মতোই নির্বোধ। এরও দায়িত্বও চাপানো হয়েছে একজন মৃতের ঘাড়ে — এই রেজিমেন্টের কর্ণেল উইলসনের ওপর। মনে হয় যে, তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্য দ্বারা রক্ষিত শত্রুর চারটি কামানের বিরুদ্ধে উইলসন অগ্রসর হন ১৮০ জন সৈন্য নিয়ে। শত্রু কারা তা আমাদের বলা হয়নি, কিন্তু ফল দেখে সিদ্ধান্ত করতে হয় তারা গোয়ালিয়র সৈন্য। ধাবিত হয়ে ইংরেজরা কামানগুলি দখল করে, তিনটে কামানের মুখ সীল করে দেয় ও কিছুক্ষণ রুখে থাকে, কিন্তু কোনো অতিরিক্ত সৈন্য না আসায় তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়, ভূপাতিত রেখে যেতে হয় ষাট জন সৈন্য ও অধিকাংশ অফিসারদের। কঠিন লড়াইয়ের প্রমাণ এই ক্ষতিটা। একটা ছোট্ট সৈন্যদল, যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে তাদের রীতিমতো মোকাবিলা করা হয়েছে, সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ পতিত না হওয়া পর্যন্ত তারা একটা ব্যাটারি দখল করে থাকছে — এটা সত্যিই একটা কঠিন লড়াই এবং দিল্লি চড়াও-দখলের পর এমন দৃষ্টান্ত এই প্রথম। তবে যে লোকটি এ অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল তাকে কোর্ট-মার্শালে বিচার করে গুলি করে মারা উচিত। উইন্ডহ্যাম বলছেন, তিনি উইলসন। উইলসন এ লড়াইয়ে নিহত, তাই জবাব দিতে পারছেন না।

সন্ধ্যায় সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য জমে কেল্লায়, বিশৃঙ্খলা সেখানে চলতেই থাকে, এবং ব্রিজের অবস্থানে স্পষ্টতই বিপদ দেখা দেয়। কিন্তু সেই সময় ক্যামবেল আসেন। তিনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, সকালে নতুন সৈন্য টেনে এনে শত্রুকে যতদূর হটিয়ে দেন তাতে ব্রিজ ও কেল্লা নিরাপদ হয়। তারপর তিনি তাঁর সমস্ত আহত, নারী শিশু ও মালপত্র পাব করিয়ে দেন ও এলাহাবাদের রাস্তায় তারা বেশ অনেকখানি এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন। এবং এটা সম্পূর্ণ শওয়া মাত্র তিনি ৬ তারিখে সিপাহীদের আক্রমণ করে পরাস্ত করেন, তাঁর ঘোসওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনী সেদিন তাদের পেছু ধাওয়া করে ১৪ মাইল পর্যন্ত। প্রতিরোধ যে কমই ছিল তা বোঝা যায় ক্যামবেলের রিপোর্ট থেকে, তিনি তাঁর স্বীয় সৈন্যদের অগ্রগমনই কেবল বর্ণনা করেছেন, শত্রুর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিরোধ বা মহড়ার কোনো উল্লেখ নেই, কোনো বাধা ছিল না, এটালড়াই নয়, নিতান্তই..ন্স্প্র। ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্রান্ট একটা হালকা ডিভিসন নিয়ে পলাতকদের অনুসরণ করেন ও ৮ তারিখে একটা নদী পেরবার সময় তাদের ধরে ফেলেন, এইভাবে নিরুপায় হয়ে তারা ঘুরে দাঁড়ায় ও প্রচণ্ড ক্ষতি হয় তাদের। এই ঘটনায় ক্যামবেলের প্রথম অভিযান, লক্ষ্ণৌ

ও কানপুর অভিযান শেষ হল, এবার নতুন একটা ধারার যুদ্ধকর্ম শুরু হবার কথা, তার প্রথম ঘটনাগুলি আমরা দুই কি তিন সপ্তাহের মধ্যে শুনব বলে আশা করতে পারি।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৫৮ সালের আনুমানিক সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
২ ফেব্রুয়ারি লিখিত New-York Daily Tribune পত্রিকার
৫২৫৩ নং সংখ্যায় ১৮৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি
প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

* হত্যাকাণ্ড — সম্পাঃ।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লক্ষ্ণৌ দখল (৮০)

ভারতীয় অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় সংকট পর্ব সমাপ্ত হল। প্রথম পর্বের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় দিল্লি এবং তার অবসান হয় দিল্লি চড়াও-আক্রমণে, দ্বিতীয়ের কেন্দ্র ছিল লক্ষ্ণৌ এবং সে জায়গাটারও এবার পতন হল। এতদিন পর্যন্ত শান্ত এলাকায় নতুন অভ্যুত্থান দেখা না দিলে বিদ্রোহ এবার থেকে ক্রমশ তার পরিশেষের একটানা পর্বটায় থিতিয়ে আসবে, যার মধ্যে অভ্যুত্থানীরা শেষ পর্যন্ত দস্যুর চরিত্র নেবে এবং যেমন ব্রিটিশদের তেমনি দেশবাসীদের কাছেও তারা হয়ে দাঁড়াবে শত্রু।

লক্ষ্ণৌ চড়াও-দখলের বিশদ বিবরণ এখনো পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রাথমিক মহড়া ও চূড়ান্ত সংঘর্ষগুলির মোট কথাগুলো জানা আছে। আমাদের পাঠকদের মনে আছে যে, লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিকে উদ্ধার করার পর জেনারেল ক্যামবেল এ ঘাঁটিটা উড়িয়ে দেন ও জেনারেল উট্র্যামকে ৫,০০০ সৈন্যসমেত মোতায়েন করেন আলমবাগে, এটা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরের একটা গেড়ে বসা অবস্থান। বাদবাকি সৈন্য নিয়ে তিনি নিজে মার্চ করে ফেরেন কানপুরে, যেখানে একদল বিদ্রোহীদের তিনি সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন ও যমুনার ওপারে কল্পিতে বিতাড়িত করেন তাদের। তারপর কানপুরে তিনি অতিরিক্ত সৈন্য ও ভারি কামান এসে পৌঁছনর জন্য অপেক্ষা করেন, আক্রমণের পরিকল্পনা সাজিয়ে নেন, অযোধ্যায় যারা অভিযান করবে সেসব বিভিন্ন বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার আদেশ দেন এবং বিশেষ করে লক্ষ্ণৌর বিরুদ্ধে যুদ্ধকর্মের নিকট ও প্রধান ঘাঁটি হিসাবে উপযুক্ত শক্তি ও আয়তন সম্পন্ন একটা সুরক্ষিত ছাউনিতে পরিণত করেন কানপুরকে। এই সব হয়ে যাবার পর আরো একটা কর্তব্য ছিল যা না পালন করে এগুনো নিরাপদ বলে তিনি ভাবেননি — এবং এ কর্তব্য পালনের প্রচেষ্টাটুকু থেকেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রায় সমস্ত ভারতীয় সেনাপতি থেকে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। শিবিরের সঙ্গে কোনো নারী তিনি রাখতে চাননি। লক্ষ্ণৌতে এবং কানপুর মার্চে 'বীরাঙ্গনা'দের ঝক্কি পোহাতে হয়েছে তাঁকে যথেষ্ট, এঁরা ভাবতেন, সৈন্যের গতিবিধি যে এঁদের খেয়াল ও আরাম মেনে চলবে সে তো স্বাভাবিক, — ভারতবর্ষে চিরকালই তাই হয়ে এসেছে। কানপুরে পৌঁছেই ক্যামবেল এই মনোহারী ও মুশকিলে সম্প্রদায়ের সবখানিকে নিজের পথ থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে দেন এলাহাবাদে, আর সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের দ্বিতীয় যে দলটি তখন আগ্রায় ছিল তাদের তলব করেন। তারা কানপুর না পৌঁছনো পর্যন্ত এবং নিরাপদে তাদের এলাহাবাদে এগিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি লক্ষ্ণৌর অভিমুখে অগ্রসর তাঁর সৈন্যদের অনুসরণ করেননি।

এই অযোধ্যা অভিযানের জন্য যে আকারে ব্যবস্থা হয় তা ভারতবর্ষে এতদিন অদৃষ্টপূর্ব। ও-দেশে ব্রিটিশদের বৃহত্তম অভিযান আফগানিস্তান আক্রমণে (৮১) নিযুক্ত সৈন্যের সংখ্যা কখনো এককালীন ২০,০০০ ছাড়ায়নি, এবং তার মধ্যে বিপুল অধিকাংশই ছিল দেশীয় সৈন্য। অযোধ্যার এই অভিযানে শুধু ইউরোপীয়দের সংখ্যাই আফগানিস্তানে প্রেরিত সমস্ত সৈন্যের চেয়ে বেশি। প্রধান যে সৈন্যদলটা স্যার কলিন ক্যামবেল নিজে

পরিচালনা করেছেন তাতে আছে তিন ডিভিশন পদাতিক, এক ডিভিশন ঘোড়সওয়ার, এবং এক ডিভিশন গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়র বাহিনী। উট্র্যামের সেনাপতিত্বে প্রথম ডিভিশন — পদাতিক — আলমবাগ দখল করে থাকে, তাতে ছিল পাঁচটি ইউরোপীয় ও একটি দেশীয় রেজিমেন্ট। দ্বিতীয় (চারটি ইউরোপীয় ও একটি দেশীয় রেজিমেন্ট), তৃতীয় (পাঁচটি ইউরোপীয় ও একটি দেশীয় রেজিমেন্ট), স্যার হোপ গ্রান্টের নেতৃত্বে ঘোড়সওয়ার ডিভিশন (তিনটি ইউরোপীয় এবং চার কি পাঁচটি দেশীয় রেজিমেন্ট) এবং সমস্ত গোলন্দাজ (আটচল্লিশটি লড়ুইয়ে কামান, দখলি-ট্রেন এবং ইঞ্জিনিয়ররা) নিয়ে ক্যামবেলের সক্রিয় বল, এই নিয়ে তিনি অগ্রসর হন কানপুর থেকে। ব্রিগেডিয়ার ফ্র্যাঙ্কসের নেতৃত্বে গোমতী ও গঙ্গার মাঝখানে জৌনপুর ও আজমগড়ে জমায়েত করা একটি ব্রিগেড গোমতীর তীর ধরে লক্ষ্ণৌর দিকে এগোবে বলে কথা ছিল। এ ব্রিগেড ছিল তিনটি ইউরোপীয় রেজিমেন্ট ও দুটি ব্যাটারি, তাছাড়া দেশীয় সৈন্য, এটির হওয়ার কথা ক্যামবেলের দক্ষিণ পার্শ্বভাগ। এটি নিয়ে ক্যামবেলের সৈন্য সর্বসমেত দাঁড়ায় :

	পদাতিক	ঘোড়সওয়ার	গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ররা	মোট
ইউরোপীয়	১৫,০০০	২,০০০	৩,০০০	২০,০০০
দেশীয়	৫,০০০	৩,০০০	২,০০০	১০,০০

অথবা, সব মিলিয়ে ৩০,০০০ জন, তার সঙ্গে যোগ করা উচিত ১০,০০০ নেপালি গুর্খা সৈন্য, এরা এগিয়ে আসে জঙ্গ বাহাদুরের নেতৃত্বে সুলতানপুরের দিকে গোরখপুর থেকে। ফলে আক্রমণকারী সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০,০০০, এবং প্রায় সবাই এরা নিয়মিত সৈন্য। কিন্তু তাই সব নয়। কানপুরের দক্ষিণে স্যার এইচ. রোজ একটা জোরালো বাহিনী নিয়ে সাগর থেকে এগোচ্ছেন কল্পি ও নিম্ন যমুনার দিকে, ফ্র্যাঙ্কস ও ক্যামবেলের দুই বাহিনীর মাঝখান দিয়ে যদি কোনো পলাতক পালিয়ে আসে তাদের সেখানে আটকাবেন তিনি। উত্তর-পশ্চিমে ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন উত্তর গঙ্গা পার হন ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ও অযোধ্যার উত্তর-উত্তর-পশ্চিম রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করেন, সঠিকভাবেই যা ধারণা করা হয়েছিল, এই এলাকাটাই ছিল অভ্যুত্থানী সৈন্যদের পশ্চাদপসরণের প্রধান জায়গা অযোধ্যা রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত শক্তির মধ্যে অযোধ্যার চারপাশের শহরগুলির দুর্গসৈন্যদেরও ধরতে হবে, ফলে এই সমস্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে নিশ্চয় ৭০,০০০ থেকে ৮০,০০০ লড়ুইয়ে, তার মধ্যে সরকারি বিবৃতি অনুসারে অন্তত ২৮,০০০ ব্রিটিশ। এর মধ্যে স্যার জন লরেন্সের সৈন্যদলটাকে ধরা হয়নি, দিল্লিতে এদের অবস্থানটা খানিকটা পার্শ্বভাগের মতো, এবং তাতে আছে মিরাট ও দিল্লির ৫,৫০০ ইউরোপীয় এবং পঞ্জাবের ২০,০০০ কি ৩০,০০০ দেশীয়।

এই বিপুল শক্তির কেন্দ্রীভবন অংশত জেনারেল ক্যামবেলের যোগাযোগকর্মের ফল, কিন্তু অংশত হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দমনেরও তা পরিণতি, যার ফলে সংগ্রাম মঞ্চের দিকে স্বভাবতই অভিকেন্দ্রিত হয়েছে সৈন্যরা। এর চেয়ে কম সৈন্য নিয়েই ক্যামবেল লড়াইয়ে নামতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে জন্য তিনি যখন তৈরি হচ্ছেন তখন ঘটনাচক্রে তাঁর হাতে এসে পড়ে নতুন শক্তি, এবং তার সুযোগ না নেবার পাত্র তিনি নন, এমন কি লক্ষ্ণৌতে যাদের সম্মুখীন হতে হবে তেমন একটা নগণ্য শত্রুর বিরুদ্ধেও। তাছাড়া ভোলা উচিত নয় যে, সংখ্যায় যতই জমকালো লাগুক, এ সৈন্যরা তখনো ছড়িয়ে আছে প্রায় ফ্রান্সের মতো বড়ো একটা এলাকা জুড়ে, এবং লক্ষ্ণৌর চূড়ান্ত ক্ষেত্রটিতে তাঁকে নামতে হবে কেবল প্রায় ২০,০০০ ইউরাপীয়, ১০,০০০ হিন্দু ও ১০,০০০ গুর্খা নিয়ে, দেশীয় সেনাপত্যাধীন এই শেষোক্ত সৈন্যদের গুরুত্ব অন্তত সন্দেহসাপেক্ষ। এই সৈন্যের শুধু ইউরোপীয় ভাগটাই দ্রুত বিজয় নিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট, তবু কর্তব্যের তুলনায় এ শক্তি অত্যধিক নয়, এবং খুব সম্ভবত, সারা দেশে ইউরোপীয়দের সংখ্যাল্পতা ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকার ভিত্তিতে যে অভ্যুত্থান জাগে তার পরিণাম হিসেবে ক্যামবেল একবার অযোধ্যাবাসীদের গোরা সৈন্যদের এমন একটা দুর্জয় বাহিনী দেখাতে চেয়েছিলেন যা ভারতের কোনো জাতি আগে কখনো দেখেনি।

অযোধ্যা সৈন্যরা ছিল অধিকাংশই বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবশিষ্টাংশ এবং দেশ থেকে জোগাড় করা কিছু নতুন সৈন্য। প্রথমোক্তদের সংখ্যা অন্তত ৩৫,০০০ কি ৪০,০০০-এর বেশি হতে পারে না। প্রথমে

৮০,০০০-এর এই শক্তিটা তরবারি, দলত্যাগ ও হতোদ্যমের ফলে নিশ্চয় অন্তত অর্ধেকে নেমে এসেছিল, এদিকে যারা বাকি ছিল তারা অসংগঠিত, ভগ্নহৃদয়, খারাপভাবে সজ্জিত, লড়াইয়ে দাঁড়াবার পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত। নতুন তোলা সৈন্যদের ১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০-এর মধ্যে নানা সংখ্যা ধরা হচ্ছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা যাই থাক, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের অস্ত্র কেবল অংশত আগ্নেয়াস্ত্র, তার নির্মাণ-নৈপুণ্য নিচু দরের। তাদের অধিকাংশই অস্ত্র ধারণ করেছিল কেবল কাছাকাছি লড়াইয়ের জন্য, ঠিক যে ধরনের লড়াই হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। এ শক্তির বৃহদাংশটা ছিল লক্ষ্ণৌতে, স্যার জে উট্র্যামের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, কিন্তু দুটি বাহিনী ছিল এলাহাবাদ ও জৌনপুরের দিকে।

লক্ষ্ণৌর ওপর অভিকেন্দ্রিক অভিযান শুরু হয় ফেব্রুয়ারির প্রায় মাঝামাঝি। ১৫ থেকে ২৬ প্রধান সৈন্যদলটা, তার প্রভূত লোকলস্কর (মাত্র শিবির অনুগামীদের সংখ্যাই ৬০,০০০) নিয়ে কানপুর থেকে মার্চ করে অযোধ্যার রাজধানীতে, কোনো প্রতিরোধ পেতে হয় না। শত্রু ইতিমধ্যে উট্র্যামের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায় ২১ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি — সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ১৯ ফ্র্যাঙ্কস এগোন সুলতানপুরের দিকে, অভ্যুত্থানীদের উভয় বাহিনীকেই পরাস্ত করেন একই দিনে, এবং ঘোড়সওয়ারের অভাবে যতখানি সম্ভব সেই ভাবে পশ্চাদ্ধাবন করেন তাদের। পরাজিত বাহিনীদুটি একত্র হওয়ায় ২৩ তারিখে ফের তিনি তাদের পরাজিত করেন, ওদের খোয়া যায় ২০টি কামান এবং সমস্ত ছাউনি ও মালপত্র। প্রধান সৈন্যদলের অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে জেনারেল হোপ গ্রান্টও জোর মার্চের সময় প্রধান বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁয়ের দিকে এগিয়ে যান এবং ২৩ ও ২৪ তারিখে লক্ষ্ণৌ-রোহিলখণ্ড পথের ওপরকার দুটি কেল্লা ধ্বংস করেন।

২ মার্চ প্রধান সৈন্যদলটা জমায়েত হয় লক্ষ্ণৌর দক্ষিণভাগের সামনে। এ দিকটা একটা ক্যানেল দিয়ে রক্ষিত, আগের বারের শহর আক্রমণে এটি পার হতে হয়েছিল ক্যামবেলকে, এই ক্যানেলের পেছনে শক্তিশালী ঘাঁটি গাড়া হয়। ৩ তারিখে ব্রিটিশরা দিলখুশা বাগান দখল করে — এটির ওপর চড়াও হামলা করেই শুরু হয় প্রথম আক্রমণটাও। ৪ তারিখে ব্রিগেডিয়ার ফ্র্যাঙ্কস প্রধান সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেন ও এবারে তার দক্ষিণ পার্শ্ব রচনা করেন। তাঁর ডান দিকটা রক্ষা করছিল গোমতী নদী। ইতিমধ্যে শত্রুর ঘাঁটির বিরুদ্ধে ব্যাটারি খাড়া করা হয় এবং শহরের নিচে গোমতীর ওপর গড়া হয় দুটি ভাসমান সাঁকো, আর এ সব প্রস্তুত হওয়া মাত্র স্যার জে. উট্র্যাম তাঁর পদাতিক ডিভিশন, ১,৪০০ ঘোড়া ও ৩০টি কামান নিয়ে পার হয়ে যান বাম দিকে বা উত্তর-পূর্ব তীরে অবস্থান নেবার জন্য। এখান থেকে তিনি ক্যানেল বরাবর শত্রুব্যূহের অনেকখানি অংশে এবং পেছনকার ঘাঁটি গাড়া বহু প্রাসাদে অগ্নিবর্ষণ করতে পারতেন, সমগ্র উত্তর-পূর্ব অযোধ্যার সঙ্গে শত্রুর যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেন তিনি। ৬ ও ৭ তারিখে তিনি প্রভূত প্রতিরোধের সম্মুখীন হন, কিন্তু শত্রুদের তাড়িয়ে দেন। ৮ তারিখে ফের আক্রান্ত হন, কিন্তু এবারেও কোনো সাফল্য হয় না। ইতিমধ্যে দক্ষিণ তীরের ব্যাটারিগুলি অগ্নিবর্ষণ শুরু করে, নদীতীর বরাবর উট্র্যামের ব্যাটারিগুলি অভ্যুত্থানীদের পার্শ্বভাগ ও পশ্চাদ্ভাগের ওপর গোলা দাগে, ৯ তারিখে স্যার ই. লুগার্ডের নেতৃত্বে ২ নং ডিভিশন মার্টিনিয়ের চড়াও-দখল করে, পাঠকদের মনে থাকতে পারে, এটি হল একটি কলেজ ও বাগান, দিলখুশার সামনে, ক্যানেলের দক্ষিণদিকে, গোমতীর সঙ্গে তার সংযোগস্থলে এটি অবস্থিত। ১০ তারিখে ব্যাঙ্ক হাউসে ভাঙন ঘটিয়ে তা চড়াও-দখল করা হয়, উট্র্যাম আরো এগিয়ে যান নদী বরাবর এবং অভ্যুত্থানীদের পর পর প্রত্যেকটি অবস্থানকে তাঁর কামানের মুখে রাখেন। ১১ তারিখে দুটি হাইল্যান্ড রেজিমেন্ট (৪২ নং ও ৯৩ নং) বেগমমহল চড়াও-দখল করে এবং নদীর বাম তীর থেকে যে পাথরের ব্রিজগুলি শহরে পৌঁছিয়েছে সেগুলো আক্রমণ করে দখল করেন উট্র্যাম। তারপর সৈন্যদের পার করিয়ে তিনি সামনের পরবর্তী ভবনটা আক্রমণে যোগ দেন। ১৩ মার্চ আর একটি সুরক্ষিত ভবন ইমামবাড়া আক্রান্ত হয়, আড়াল নিয়ে ব্যাটারি নির্মাণের জন্য পরিখা খোড়া হয়। পরের দিন ভাঙনটা সম্পূর্ণ হলে এ ভবনটিকে চড়াও-দখল করা হয়। শত্রু কাইজারবাগ বা রাজপ্রাসাদে পলায়নের সময় এমন জোর পশ্চাদ্ধাবন করা হয় যে প্রায় পলাতকদের পায়ে পায়েই ব্রিটিশরা সেখানে ঢোকে। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়, কিন্তু বেলা তিনটা নাগাদ প্রাসাদ চলে যায়

ব্রিটিশদের হাতে। মনে হয় এর ফলেই সংকট পাকিয়ে ওঠে, অন্তত, প্রতিরোধের সমস্ত প্রেরণা যেন অদৃশ্য হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন ও আটকানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ক্যামবেল। এক ব্রিগেড ঘোড়সওয়ার ও কিছু অশ্ববাহিত কামান সহ ব্রিগেডিয়ার ক্যামবেলকে পাঠানো হয় পশ্চাদ্ধাবনে, আর অন্য ব্রিগেডটিকে গ্রান্ট ঘুরিয়ে নিয়ে যান সীতাপুরের দিকে, লক্ষ্ণৌ-রোহিলখণ্ড রাস্তায়, তাদের পথ আটকাবার জন্য। রক্ষী সৈন্যদেরযে অংশটা পালাল তাদের বিরুদ্ধে এই ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার পর যারা তখনো রুখে থাকছে তাদের হাত থেকে শহর মুক্ত করার জন্য পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী শহরের আরো গভীরে প্রবেশ করে। নদীতীর বরাবর প্রাসাদ ও বাগিচা শ্রেণি আগেই দখল হওয়ায় ১৫ থেকে ১৯ লড়াই অবশ্য প্রধানত চলে শহরের সঙ্কীর্ণ রাস্তায় রাস্তায়। কিন্তু ১৯ গোটা শহর আসে ক্যামবেলের দখলে। শোনা যায় প্রায় ৫০,০০০ অভ্যুত্থানী পালিয়েছে, অংশত রেহিলখণ্ডে অংশত দোয়াব ও বুন্দেলখণ্ডের দিকে। এই শেষোক্ত পথে তাদের পরিত্রাণের একটা সম্ভাবনা আছে, কারণ সসৈন্যে জেনারেল রোজ এখনো যমুনা থেকে অন্তত ৬০ মাইল দূরে এবং তাঁর সম্মুখে নাকি ৩০,০০০ অভ্যুত্থানী। রোহিলখণ্ডের দিকে তাদের ফের জমায়েত হবারও একটা সম্ভাবনা আছে অতি দ্রুত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার অবস্থায় ক্যামবেল নেই, এদিকে চেম্বারলেনের ঠিকঠিকানা আমরা কিছুই জানি না, আবার অল্প সময়ের মতো এদের আশ্রয় দেবার পক্ষে প্রদেশটা যথেষ্ট বড়ো। অভ্যুত্থানের পরবর্তী পর্যায় তাই খুব সম্ভবত হবে বুন্দেলখণ্ড ও রোহিলখণ্ডে অভ্যুত্থানী সৈন্যবাহিনী দুটির পঙ্‌ক্তি-বন্ধন, তবে এই শেষের স্থানটির বাহিনী লক্ষ্ণৌ ও দিল্লি সৈন্যের অভিকেন্দ্রিক মার্চে অচিরেই ধ্বংস হতে পারে।

এ অভিযানে স্যার সি. ক্যামবেলের যুদ্ধকর্ম যতটা আমরা বিচার করতে পারছি তা তাঁর স্বাভাবিক বিচক্ষণতা ও উদ্যমে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত। লক্ষ্ণৌর ওপর তাঁর অভিকেন্দ্রিক মার্চের বিন্যাসটা চমৎকার এবং আক্রমণের আয়োজনে সবকিছু পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। অন্যদিকে অভ্যুত্থানীদের আচরণ আগের চেয়ে বেশি না হলেও সমান জঘন্য। লাল কোর্তাদের দেখা মাত্রই তারা সর্বত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফ্র্যাঙ্কসের বাহিনী প্রায় একটি সৈন্যও না খুইয়ে যাদের পরাস্ত করেছে সংখ্যায় তারা এদের কুড়ি গুণ, এবং তারবার্তায় চিরাচরিত ‘প্রবল প্রতিরোধ’, ‘তুমুল লড়াই’-এর কথা থাকলেও, ব্রিটিশ ক্ষতির উল্লেখ যদি বা কোথাও করা হয়েছে, তা এতই হাস্যকর রকমের অল্প লাগে যে, আমাদের মনে হয়, ব্রিটিশেরা আগেরবার সেখানে পৌঁছবার সময় যা ঘটেছিল তার চেয়ে বেশি বীরত্বের প্রয়োজন পড়েনি, তার চেয়ে বেশি জয়মাল্য অর্জিত হয়নি।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৫৮ সালের ১৫ এপ্রিল লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫৩১২ নং সংখ্যায়
১৮৫৮ সালের ৩০ এপ্রিল প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

*লক্ষ্ণৌ আক্রমণের বিশদ বিবরণ

লক্ষ্ণৌ আক্রমণ ও পতনের বিশদ বিবরণ অবশেষে পাওয়া গেছে। সামরিক দিক থেকে সংবাদের প্রধান সূত্র হল স্যার ক্যামবেলের ডিসপ্যাচগুলি — তা কিন্তু এখনো প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু ব্রিটিশ প্রেসের সংবাদ এবং বিশেষ করে The London Times-এ মিঃ রাসেলের যে পত্রের প্রধান অংশগুলি ইতিপূর্বেই আমাদের পাঠকদের সামনে দেওয়া হয়েছে, তা আক্রমণকারী দলটির হালচাল সাধারণভাবে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।

তারবার্তার সংবাদ পেয়ে প্রতিরক্ষায় অজ্ঞতা ও ভীরুতার যে সিদ্ধান্ত আমরা টেনেছিলাম, তা বিশদ বিবরণে সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হচ্ছে*। হিন্দুরা যেসব ঘাঁটি খাড়া করেছিল, তা দেখতে দুর্জয় হলেও আসলে

চিনা 'সাহসীদের' ঢালে বা নগর-প্রাচীরে যেসব আগুনে ড্রাগন ও বিকৃত বদনের ছবি আঁকা থাকে তার চেয়ে বেশি কার্যকরী নয়। প্রতিটি ঘাঁটিতেই বাহ্যত দুর্ভেদ্য একটা সম্মুখভাগ ছিল, চোখে পড়ত কেবলি ছিদ্রসজ্জিত দেওয়াল ও প্যারাপেট, ঢোকার পথে সবরকমের সম্ভাব্য বাধা, সর্বত্রই গিজগিজ করছে কামান আর বন্দুক। কিন্তু প্রতিটি ঘাঁটিরই পার্শ্বভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ একেবারে অবহেলা করা হয়, বিভিন্ন ঘাঁটির পরস্পর সমর্থনের কথা একবারও ভাবা হয়নি, এমন কি তাদের অন্তর্বর্তী জায়গা ও সামনের জায়গাটাও পরিষ্কার রাখা হয়নি, ফলে প্রতিরক্ষীদের অজান্তেই সামনে ও পার্শ্বভাগ উভয় দিক থেকেই আক্রমণের তোড়জোড় সম্ভব ছিল, এবং সুন্দর আশ্রয়ের আড়ালে এসে পৌঁছতে পারত প্যারাপেটের একেবারে কয়েক গজের মধ্যে। অফিসারদের থেকে যারা বিচ্ছিন্ন এবং কাজ করছে এমন একটা আর্মিতে, যেখানে অজ্ঞতা ও বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত রাজত্ব, তেমন একদল প্রাইভেট স্যাপারের কাছ থেকে ঠিক এই ধরনের জগাখিচুড়ি ঘাঁটি-নির্মাণই প্রত্যাশিত। লক্ষ্ণৌর ঘাঁটি-গঠন হল সেঁকা ইঁটের দেওয়াল আর মাটির প্যারাপেটের ভাষায় গোটা সিপাহী-যুদ্ধ-পদ্ধতিটারই অনুবাদ। ইউরোপীয় রণকৌশলের অভ্যাসিক (mechanical) দিকটা তাদের মনে আংশিক মুদ্রিত হয়ে ছিল, ম্যানুয়েল ও প্লেটুন ড্রিল ভালোই জানত তারা, ব্যাটারিও বানাতে পারত, ছিদ্রসজ্জিত করতে পারত দেওয়াল, কিন্তু একটা ঘাঁটি রক্ষায় বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যাটালিয়নের গতিবিধি কী কষে যোজনা করতে হয়, অথবা কী করে প্রতিরোধ-সমর্থ একটা ঘাঁটি-গাড়া শিবির গড়ার জন্য ব্যাটারি ও চিদ্রসজ্জিত ঘরবাড়ি ও দেওয়াল মেলাতে হয় — এ সব তারা একেবারেই জানত না। তাই, তারা অতি ছিদ্র করে তাদের প্রাসাদের নিরেট পাকা দেওয়ালকে দুর্বল করে তোলে, স্তরের পর স্তর গুলিমুখ ও গোলামুখের ব্যবস্থা করে, ছাতের ওপর বসায় প্যারাপেট ঘেরা ব্যাটারি, এবং এ সবই একেবারে নিষ্ফল, কেননা অতি অনায়াসে এ সব ঘেরাও করা যেত। কেই ভাবে রণকৌশলের অপকর্ষ জানা থাকায় তারা তা পুষিয়ে নিতে চায় প্রতিটি পোস্টে যত বেশি সম্ভব লোক ঠেসে — যার ফল শুধু ব্রিটিশ কামানের প্রতিক্রিয়াকে আরো ভয়াবহ করে তোলা এবং অপ্রত্যাশিত এক কোণ থেকে এই বিশৃঙ্খল দঙ্গালের ওপর আক্রমণকারী দল ঝাঁপিয়ে পড়া মাত্র সুশৃঙ্খল ও নিয়মবদ্ধ যে কোনো রূপ প্রতিরক্ষাই অসম্ভব করে তোলা। ব্রিটিশেরা যখন দৈবচক্রে ঘাঁটির দুর্জয় সম্মুখভাগ আক্রমণ করতে বাধ্য হয়, তখনো তার নির্মাণ এতই ত্রুটিবহুল যে প্রায় কোনো ঝুঁকি না নিয়েই এগিয়ে গিয়ে, ভেঙে থকল করা গেছে। এই ব্যাপার ঘটে ইমামবাড়ায়। দালানের কয়েক গজ দূরে ছিল একটা পাকা (রোদে সেঁকা মাটির) দেওয়াল। এই দেওয়াল পর্যন্ত ব্রিটিশেরা একটা ছোটো পরিখা বানায় (তাতেই প্রমাণ হয় যে দালানের ওপর দিকের গোলামুখ ও গুলিমুখগুলো থেকে ঠিক সামনের জমিটায় কোনো ঢালাও অগ্নিবর্ষণ করা যায়নি) এবং হিন্দুরা নিজেরাই যা তৈরি করে দিয়েছিল সেই দেওয়ালটাকেই তারা ব্যবহার করে ভাঙন-ব্যাটারি হিসাবে! এই দেওয়ালের পেছনে তারা নিয়ে আসে দুটি ৬৮ পাউন্ডি কামান (নৌবহরী কামান)। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে লঘুতম ৬৮ পাউন্ডি কামানের ওজন গাড়ি বাদে ৮৭ হন্দর, ধরাই যাক যে শুধু ফাঁপা গোলা দাগার জন্য একটা ৮ ইঞ্চি কামানের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সে ধরনের লঘুতম কামানের ওজনও ৫০ হন্দর এবং গাড়ি সমেত অন্তত ৩ টন। কয়েক তলা উঁচু যে প্রাসাদের ছাতের ওপর ব্যাটারি রয়েছে তার এত কাছে এমন কামান যে আদৌ নিয়ে আসা গেল, তা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে কম্যান্ডিং ঘাঁটিগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য এবং সামরিক ইঞ্জিনিয়রিঙে এমন অজ্ঞতা, যা কোনো সভ্য সৈন্যবাহিনীর কোনো প্রাইভেট স্যাপারের পক্ষে অসম্ভব।

যে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের যুঝতে হয়েছে এই হল তার বিজ্ঞানের দিকটা। আর সাহস ও একরোখামি — প্রতিরক্ষায় তাও সমান অনুপস্থিত। একটা দল আক্রমণে এগুলেই মার্টিনিয়ের থেকে মুসাবাগ পর্যন্ত সর্বত্র দেশীয়দের পক্ষ থেকে হয়েছে শুধু একটি বৃহৎ একমত ভোঁ-দৌড়ের ঘটনা। সমগ্র সংঘাতগুলির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা এমন কি ক্যামবেলের রেসিডেন্সি-ত্রাণ কালে সেকান্দারবাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে (কেননা তাকে যুদ্ধ বলা কঠিন) তুলনীয়। আক্রমণকারী পক্ষ এগুতে শুরু করলেই এলোমেলো ধাবন শুরু হয় পশ্চাদ্ভাগের দিকে, আর যেখানে বহির্গমনের অল্প কয়েকটি সংকীর্ণ পথ বর্তমান সেখানে ভীড়াক্রান্ত দঙ্গালটা থেমে যায় আর বিনা প্রতিরোধে আগুয়ান ব্রিটিশের গুলি ও বেঅনেটে কচু কাটা হয়ে পড়ে। আতঙ্কিত দেশীয়দের ওপর এই রকম একটা আক্রমণেই 'ব্রিটিশ বেঅনেট' যত হত্যা করেছে, তা ইউরোপ ও আমেরিকা

মিলিয়ে ইংরেজরা যত যুদ্ধ করেছে তার চেয়েও বেশি। প্রাচ্যে এই ধরনের বেঅনেটে যুদ্ধ, যেখানে শুধু এক পক্ষ সক্রিয় এবং অন্য পক্ষ লজ্জাকর রূপে নিষ্ক্রিয় তা যুদ্ধের একটা নিয়মিত ঘটনা, প্রতিক্ষেত্রেই দৃষ্টান্ত দিয়েছে বর্মী স্টকেড (৮২)। রাসেলের বিবরণ অনুসারে ব্রিটিশের প্রধান ক্ষতি করেছে সেই সব হিন্দুরা যাদের পশ্চাদপসরণের পথ ছিল না, প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ব্যারিকেড করে তারা জানলা দিয়ে আঙিনা ও বাগানের অফিসারদের ওপর গুলি চালায়।

ইমামবাড়া ও কাইজারবাগ আক্রমণে হিন্দুদের পিছুদৌড় এত সত্বর হয় যে জায়গাটা দখল করতে হয়নি, নিতান্ত মার্চ করে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্যের সেটা শুরু মাত্র, মিঃ রাসেলের ভদ্র মন্তব্য অনুসারে সেদিন কাইজারবাগ জয় এত অপ্রত্যাশিত হয় যে, নির্বিচার লুণ্ঠন আটকাবার সময় ছিল না। তারই ব্রিটিশ গ্রেনেডিয়াররা অবাধে অযোধ্যা প্রভুর জড়োয়া, দামি দামি অস্ত্র, বেশভূষা ও সর্ববিধ কাপড়চোপড় হস্তগত করছে, এ দৃশ্য খাঁটি মুক্তিপ্রিয় জন বুলের কাছে ভারি মজার লেগেছিল নিশ্চয়। শিখ, গুর্খা ও লোকলস্করেরা এ দৃষ্টান্ত অনুসরণে খুবই রাজী ছিল এবং লুন্ঠন ও ধ্বংসের যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তা স্পষ্টই মিঃ রাসেলের বর্ণনা ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যায়। অগ্রগমনের প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে লুটপাট ও বিধ্বংস। ১৪ তারিখে পতন হয় কাইজারবাগের আর আধঘন্টার মধ্যেই ইতি হয় শৃঙ্খলার, সৈন্যদের ওপর অফিসারদের সমস্ত দখল লোপ পায়। ১৭ তারিখে বাধ্য হয়ে জেনারেল ক্যামবেল লুটপাট আটকাবার জন্য পেট্রল বসান এবং 'বর্তমান যথেচ্ছাচার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত' নিষ্ক্রিয় থাকেন। স্পষ্টতই সৈন্যরা একেবারে হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। ১৮ তারিখে শোনা গেল, স্থূলতম ধরনের লুটপাট বন্ধ হয়েছে কিন্তু ধ্বংসকার্য তখনো অবাধে চলেছে। এদিকে শহরে অগ্রবাহিনী যখন ঘরবাড়ির ভেতর থেকে দেশীয়দের গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে লড়ছে, পশ্চাৎ বাহিনী যখন সাধ মিটিয়ে লুটপাট ও ধ্বংস চালিয়েছে। সন্ধ্যায় লুটপাটের বিরুদ্ধে আরেকটি ঘেঅষা জারি হয়, প্রতি রেজিমেন্ট থেকে শক্তিশালী দল পাঠিয়ে নিজেদের সৈন্যদেরই ফিরিয়ে আনতে হবে আর ঘরে বসিয়ে রাখতে হবে লোকলস্করদের, ডিউটি ছাড়া কেউ শিবির থেকে বাইরে যেতে পাবে না। ২০ তারিখেও ওই একই আদেশের পুনরাবৃত্তি। সেই দিনই দুজন ব্রিটিশ 'অফিসার ও ভদ্রলোক' লেফটন্যান্ট কেপ ও থ্যাকওয়েল 'শহরে যান লুট করতে ও একটি গৃহে নিহত হন।' আর ২৬ তারিখেও অবস্থা তখনো এত খারাপ যে লুটপাট ও বলাৎকার দমনের জন্য অতি কঠোরতম নির্দেশ জারি করা হয়, শুরু হয় 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোলকল, শহরে প্রবেশ সমস্ত সৈন্যের পক্ষে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়, শিবিরানুগামীদের শহরে সশস্ত্র অবস্থায় দেখলে ফাঁসি দেওয়া হবে, সৈন্যরা শুধু ডিউটির সময় ছাড়া অস্ত্র বহন করতে পাবে না, এবং সমস্ত অ-যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করতে হবে। এ নির্দেশকে যথারীতি গুতুত্ব দেবার জন্য 'উপযুক্ত জায়গাগুলিতে' বেতমারার কয়েকটি ত্রিভুজ কাড়া করা হয়।

১৯শ শতকের সভ্য সৈন্যবাহিনীর এ হাল সত্যিই জবর, বিশ্বের অন্য কোনো সৈন্য যদি এ অনাচারের এক দশমাংশও করত, তাহলে রুষ্ট ব্রিটিশ প্রেস কী ধিক্কারেই না লাঞ্ছিত করত তাদের! কিন্তু এ হল ব্রিটিশ সৈন্যের কীর্তি, তাই বলা হচ্ছে এ সব নাকি যুদ্ধের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। গৌরবস্থলের আশেপাশে যে কোনো রূপার চামচ, জড়োয়া বালা বা অন্য ছোটোখাটো স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যাবে, তা হস্তগত করতে ব্রিটিশ অফিসার ও ভদ্রলোকেদের জন্য কোনো সঙ্কোচ রাখা হয়নি, এবং ক্যামবেল যদি যুদ্ধ চলা কালেই পাইকারি ডাকাতি ও খুনজখম বন্ধ করার জন্য নিজ সৈন্যবাহিনীকেই নিরস্ত্র করতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তবে এ ব্যবস্থার পিছনে সামরিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই এত হয়রানি ও ক্লেশের পর বেচারা লোকগুলোর এক হপ্তা ছুটি ও একটু আমোদে কেউ ব্যাজার হবে না।

বস্তুত, ব্রিটিশদের মতো এত পাশবিকতা ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো নৈস্যবাহিনীতে নেই। লুটপাট, বলাৎকার, হত্যাকাণ্ড — অন্য সব জায়গায় যা কঠোর ও সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত তা ব্রিটিশ সৈনিকের সনাতন অধিকার, মৌরসী স্বত্ব। উপদ্বীপীয় যুদ্ধে (পরিনীজ) বাদাখোজ ও সান সেবাস্তিয়ান দখলের পর দিনের পর দিন যে কেলেঙ্কারি চালানো হয় (৮৩), তার তুলনা ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত থেকে অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে নেই, এবং হামলা করে জয় করা একটা শহরে লুটপাট চালাবার যে মধ্যযুগীয় প্রথা অন্য

সর্বত্র পরিত্যক্ত হয়েছে, তা ব্রিটিশদের কাছে এখনো রীতি। দিল্লিতে জরুরী সামরিক বিবেচনায় ব্যতিক্রম হতে বাধ্য হয়, কিন্তু বাড়তি বেতনে কেনা হলেও আর্মি গজগজ করেছিল এবং এখন দিল্লিতে যা ফসকে ছিল তার শোধ তারা তুলল লক্ষ্ণৌতে। বারো দিন বারো রাত ধরে লক্ষ্ণৌতে কোনো ব্রিটিশ আর্মি ছিল না, ছিল শুধু এক বেআইনি, মাতাল, পাশবিক জনতা, যা ভেঙে যায় এমন সব ডাকাত-দলে, যারা সদ্যবিতাড়িত সিপাহীদের চেয়ে অনেক বেশি বেআইনি, মারমুখী ও লোলুপ। ব্রিটিশ সামরিক সার্বিসের চিরস্থায়ী কলঙ্ক হয়ে থাকবে ১৮৫৮ সালের লক্ষ্ণৌ লুট।

ভারতের ওপর সভ্যীকরণ ও মানবীকরণ প্রগতি চালিয়ে বেপরোয়া সৈন্যরা যদি বা কেবল দেশীয়দের অস্থাবর সম্পত্তিই লুট করেছে, ব্রিটিশ সরকার আবার অব্যবহিত পরেই এসে তাদের স্থাবর সম্পত্তিও কেড়ে নিলেন। কোথায় লাগে প্রথম ফরাসি বিপ্লবে অভিজাতদের ও গির্জার জমি বাজেয়াপ্তি! কোথায় লাগে লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক অরলিয়োঁ বংশের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি! এই দেখুন লর্ড ক্যানিং, কথাবার্তা আদবকেতা ও অনুভূতিতে নম্র এক ব্রিটিশ অভিজাত, উপরওয়ালা ভাইকাউন্ট পামারস্টোনের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত করছেন গোটা একটা জাতির জমি — দশ হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী তার প্রতিটি কাঠা, বিঘা ও একর (৮৪)। জন বুলের জন্য সত্যিই তোফা একটু লুট! আর নতুন সরকারের নামে লর্ড এলেনবরো এই অভূতপূর্ব ব্যবস্থা না-মঞ্জুর করার সঙ্গে সঙ্গেই এই সামগ্রিক দস্যুতা সমর্থনের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে ঌপ্র ঌঁপ্রন্ধ ও এক পাল ব্রিটিশ পত্রিকা, জন বুলের যা খুশি তাই বাজেয়াপ্ত করার অধিকারের পক্ষ নিয়ে তারা লাঠি হাঁকাচ্ছে। কিন্তু জন বুল যে এক অসাধারণ জীব আর ঌপ্র ঌঁপ্রন্ধ অনুসারে তার সেইটেই গুণ যা অন্যের কলঙ্ক।

ইতিমধ্যে লুঠের জন্য ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ ভাঙনের দৌলতে অভ্যুত্থানীরা খোলা মাঠঘাটে পালায়, কেউ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে না। তারা জমা হচ্ছে রোহিলখণ্ডে, আর একটা অংশ ছোটোখাটো লড়াই চালাচ্ছে অযোধ্যায়, আরেকদল পলাতক বুন্দেলখণ্ডের পথ ধরেছে। সেই সঙ্গে গরম কাল ও বর্ষা দ্রুত এগিয়ে আসছে, এবং গত বছরের মতো এ ঋতুও ইউরোপীয় ধাতের পক্ষে তেমনি অস্বাভাবিক অনুকূল হবে তা আশা করা যায় না। তখন ইউরোপীয় সৈন্যদের ব্যাপক অংশের কাছে আবহাওয়া ন্যূনাধিক গা-সহা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এবার তাদের অধিকাংশই সদ্যাগত। কোনো সন্দেহ নেই যে জুন, জুলাই ও আগস্টের অভিযানে ব্রিটিশদের বহু প্রাণহানি সইতে হবে এবং প্রতিটি বিজিত শহরে যে রক্ষী সৈন্য রাখতে হবে তাতে সক্রিয় সৈন্যের ভাগটা দ্রুত কমে আসবে। ইতিমধ্যেই শোনা গেছে যে মাসে ১,০০০ সৈন্যের নতুন জোগানেও সৈন্যবাহিনীর কার্যকরী ক্ষমতা বিশেষ বজায় থাকবে না, আর রক্ষী সৈন্যের কথা ধরলে, এক লক্ষ্ণৌরই দরকার অন্তত ৮,০০০ লোক, যা পরিমাণে ক্যামবেলের সৈন্যবাহিনীর এক তৃতীয়াংশের বেশি। রোহিলখণ্ড অভিযানের জন্য যে সৈন্যদল সংগঠিত হচ্ছে তারা এই লক্ষ্ণৌ দুর্গসৈন্যদের চেয়ে বিশেষ বেশি হবে না। আরো জানা গেছে, ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে এই মত বাড়ছে যে, অভ্যুত্থানীদের বড়ো বড়ো দল ভেঙে ছড়িয়ে পড়ার পর নিশ্চিতই যে গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ চলবে তা এই অবস্থান লড়াই ও অবরোধের বর্তমান যুদ্ধের চেয়ে ব্রিটিশদের পক্ষে বেশি জ্বালাতনকর ও প্রাণহানিকর হবে। আর পরিশেষে, শিখরা এমন ভাবের কথাবার্তা কইতে শুরু করেছে যা ইংরেজদের পক্ষে শুভ নয়। তারা অনুভব করছে যে তাদের সাহায্য ছাড়া ব্রিটিশেরা ভারত দখলে রাখতে পারত না এবং তারা অভ্যুত্থানে যোগ দিলে হিন্দুস্তান নিশ্চিতই, অন্তত কিছু কালের জন্য ইংলন্ডের হাতছাড়া হয়ে যেত। এ কথা তারা স্পষ্টই বলছে এবং বাড়িয়ে তুলছে প্রাচ্য ধরনে। মুড়কি, ফিরোজশা ও আলিওয়ালে যারা তাদের হারিয়েছিল সেই ইংরেজরা তাদের কাছে তেমন একটা উচ্চতর জাত বলে এখন ঠেকছে না (৮৫)। এ ধরনের প্রত্যয় থেকে প্রকাশ্য বিরোধিতা প্রাচ্য জাতিদের কাছে একটা পদক্ষেপ মাত্র, একটা স্ফুলিঙ্গেই আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

মোটের ওপর দিল্লি দখলে যেমন ভারতীয় অভ্যুত্থান দমিত হয়নি, তেমনি লক্ষ্ণৌ দখলেও নয়। গ্রীষ্মের অভিযানে এমন সব ঘটনা ঘটতে পারে যাতে সামনের শীতে ব্রিটিশদের বহু পরিমাণে কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে, এমন কি হয়ত বা পুনর্জয় করতে হবে পঞ্জাবকে। কিন্তু অন্তত সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও, তাদের

সামনে রয়েছে একটা দীর্ঘ ও জ্বালাতনী গেরিলা যুদ্ধ — ভারতীয় রৌদ্রতলে জিনিসটা ইস্করোপীয়দের কাছে খুব ঈর্ষার বস্তু নয়।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৫৮ সালের ৮ মে লিখিত
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫৩৩৩ নং সংখ্যায়
১৮৫৮ সালের ২৫ মে প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে

---

* এই সংকলনের ১৪৪-১৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য — সম্পাঃ।

কার্ল মার্কস

অযোধ্যা গ্রাস (৮৬)

প্রায় আঠারো মাস আগে ক্যান্টনে ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক আইনে অভিনব এই মতবাদ প্রচার করে যে, কোনো একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধাবস্থা প্রতিষ্ঠা না করেও আর একটা রাষ্ট্র তার কোনো একটা প্রদেশের বিরুদ্ধে বৃহদাকারে সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে পারে। এবার সেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের বড়োলাট লর্ড ক্যানিং-এর মাধ্যমে প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন উল্টে দেবার কাজে আরেকটি পদক্ষেপ করেছে। ঘোষণা করেছে যে,

‘অযোধ্যা প্রদেশের জমির মালিকানা স্বত্ব ব্রিটিশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হল, সে-সরকার যথোপযুক্ত বোধে সে স্বত্বের ব্যবহার করবে।’ (৮৭)

১৮৩১ সালে ওয়ার্সর পতনের পর (৮৮) বহু পোলীয় অভিজাত তৎযাবৎ ‘ভূমির যে মালিকানা স্বত্ব’ ভোগ করে আসছিলেন তা রুশ সম্রাট* বাজেয়াপ্ত করেন, তখন ব্রিটিশ সংবাদপত্রে ও পার্লামেন্টে সর্বসম্মত এক ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। নোভারা লড়াইয়ের পর (৮৯) অস্ট্রীয় সরকার যখন বাজেয়াপ্ত নয়, মাত্র আটক করেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সক্রিয় অংশীদার লম্বার্দ, অভিজাতদের জমি, তখন ফের সেই ব্রিটিশ ক্রোধের সর্বসম্মত বহিঃপ্রকাশের পুনরাবৃত্তি হয়। এবং যখন ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের পর লুই নেপোলিয়ন অরলিয়োঁ বংশের ভূমি-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, যা ফ্রান্সের সাধারণ আইন অনুসারে লুই ফিলিপের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি খাতে জমা পড়া উচিত ছিল কিন্তু আইনি প্যাঁচে সে ভাগ্য এড়িয়ে যায়, তখন ব্রিটিশ ক্রোধের আর সীমাপরিসীমা থাকেনি, এবং ৯প্র [illegible] ৯ঁপ্রন্ধ ঘোষণা করে যে এতে করে সামাজিক ব্যবস্থার বনিয়াদটাই উল্টে দেওয়া হচ্ছে, সভ্য সমাজ আর টিকতে পারবে না। এই সব সৎ ক্রোধের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এবার পাওয়া গেছে। কলমের এক খোঁচায় ইংলন্ড শুধু কতিপয় অভিজাত বা এক রাজ বংশের সম্পত্তিই নয়, বাজেয়াপ্ত করেছে প্রায় আয়র্ল্যান্ডের মতো বৃহৎ একটা রাজ্যের (৯০) গোটা এলাকা, স্বয়ং লর্ড এলেনবরো-র ভাষায় ‘একটা গোটা জাতির উত্তরাধিকার।’

কিন্তু শোনা যাক এই অশ্রুতপূর্ব ব্যবস্থার — যুক্তি বলা চলবে না — কী অজুহাত লর্ড ক্যানিং দিচ্ছেন ব্রিটিশ সরকারের নামে, প্রথম ‘লক্ষ্ণৌ সৈন্যবাহিনীর দখলে।’ দ্বিতীয় ‘বিদ্রোহী সৈন্যদের শুরু করা প্রতিরোধ শহর এবং সাধারণভাবে প্রদেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছে।’ তৃতীয়, ‘ওরা এক মহা অপরাধে এবং ন্যায্য প্রতিশোধের আওতায় ফেলেছে নিজেদের।’ সোজা কথায়, যেহেতু ব্রিটিশ সৈন্য লক্ষ্ণৌ অধিকার করেছে, তাই অযোধ্যার যেসব জমি এখনো হস্তগত করতে পারেনি তা সব বাজেয়াপ্ত করার অধিকার আছে সরকারের। ব্রিটিশ বেতনভুক্ত দেশীয় সৈন্যরা যেহেতু বিদ্রোহ করেছে, তাই অযোধ্যায় যে দেশীয়দের বলপূর্বক ব্রিটিশ শাসনের অধীন করা হয়েছিল, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অভ্যুত্থানের কোনো অধিকার তাদের নেই। সংক্ষেপে, অযোধ্যার লোকেরা ব্রিটিশ সরকারের বৈধ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং ব্রিটিশ সরকার এখন পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে বাজেয়াপ্তির যুক্তি হিসাবে বিদ্রোহই যথেষ্ট। সুতরাং লর্ড ক্যানিঙের সমস্ত

ধানাই-পানাই বাদ দিলে গোটা প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই যে, তিনি ধরে নিচ্ছেন অযোধ্যায় ব্রিটিশ শাসন বৈধভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অযোধ্যায় ব্রিটিশ শাসন কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ভাবে, ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসি যখন ভাবলেন ব্যবস্থা গ্রহণের সময় হয়েছে, তখন তিনি কানপুরে একদল সৈন্যসমাবেশ করলেন, অযোধ্যার রাজাকে* বলা হল, ওটা নেপালের বিরুদ্ধে একটা পর্যবেক্ষণ কোর হিসাবে কাজ করবে। এই সৈন্যবাহিনী সহসা অভিযান করে লক্ষ্ণৌ দখল ও রাজাকে বন্দী করে। ব্রিটিশদের হাতে দেশটা তুলে দেবার জন্য তাঁকে তাগাদা দেওয়া হয়, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। তখন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় ও দেশটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এলাকাভুক্ত করে নেওয়া হয়। এই বেইমানি আক্রমণের ভিত্তি হল লর্ড ওয়েলসলি সম্পাদিত ১৮০১ সালের চুক্তির ৬ নং ধারা (৯১)। এ চুক্তিও ছিল ১৭৯৮ সালে স্যার জন শোর সম্পাদিত চুক্তির স্বাভাবিক পরিণতি। দেশীয় রাজাদের সহিত আচরণে ইঙ্গ-ভারতীয় সরকারের সাধারণ কর্মনীতি অনুসারে ১৭৯৮ সালের এই প্রথম চুক্তিটি ছিল উভয় পক্ষের আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীর একটি চুক্তি। এতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাওনা হয় বছরে ৭৬ লক্ষ টাকার (৩৮ লক্ষ ডলার) একটা ভরণপোষণ, কিন্তু ১২ নং ও ১৩ নং ধারা অনুসারে রাজা দেশের করভার হ্রাস করতে বাধ্য থাকেন। বস্তুতপক্ষে, এ দুটি শর্ত প্রকাশ্যেই পরস্পর বিরোধী, এবং যুগপৎ এ দুটি পূরণ করা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যাশিত সে পরিণতি থেকে দেখা দেয় নতুন জটিলতা, তার ফল ১৮০১ সালের চুক্তি, যার বলে ভূতপূর্ব চুক্তির তথাকথিত লঙ্ঘনের জন্য রাজ্যের একাংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছেড়ে দিতে হয়। প্রসঙ্গত, এ ভাবে অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া সে-সময় পার্লামেন্টে ডাহা ডাকাতি বলে নিন্দিত হয়, লর্ড ওয়েলসলির পরিবারের যে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল, তা না থাকলে তখন তাঁকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হতে হত।

এই ভাবে অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৩ নং ধারা বলে রাজার বাকি এলাকা সমস্ত বৈদেশিক ও ঘরোয়া শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়, এবং ৬ নং ধারায় এই সব অঞ্চলের মালিকানা চিরকালের জন্য তাঁর ও তাঁর বংশধর ও উত্তরাধিকারীদের জন্য গ্যারান্টি করা হয়। কিন্তু এই ৬ নং ধারাতেই রাজার জন্য একটি ফাঁদও থাকে, যথা, রাজা প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি এমন এক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তাঁরই কর্মচারীরা চালু করবে ও যা তাঁর প্রজাদের সমৃদ্ধির অনুকূল হবে, অধিবাসীদের ধনপ্রাণ নিরাপদ করবে। এখন রাজা যদি এ চুক্তি ভঙ্গ করেন, তাঁর সরকার মারফত অধিবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষা না করেন (ধরা যাক, তাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে এবং সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে), তাহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর কী করতে পারে? চুক্তি মতে রাজা স্বাধীন সার্বভৌম, স্বাধীন কর্তা, অন্যতম চুক্তিকারী পক্ষ বলে স্বীকৃত। চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে সুতরাং না নাকচ হয়ে গেল এই ঘোষণার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুটি পথ ছিল, হয় চাপ দিয়ে আলাপ আলোচনা মারফত নতুন একটা ব্যবস্থায় আসা, নয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা না করে তাঁর রাজ্যে অভিযান করা, অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে বন্দী করা। সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর এলাকা গ্রাস করা শুধু চুক্তির নয়, আন্তর্জাতিক আইনের প্রত্যেকটি নীতিরই লঙ্ঘন।

অযোধ্যা গ্রাস যে ব্রিটিশ সরকারের একটা আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয় তা একটা মজার তথ্যে প্রমাণিত হয়। লর্ড পামারস্টোন ১৮৩০ সালে পররাষ্ট্র সচিব হওয়া মাত্রই তিনি তদানীন্তন বড়োলাটকে* অযোধ্যা গ্রাস করার হুকুম পাঠান। অধঃস্তনটি সে সময় তাঁর প্রস্তাব কাজে পরিণত করতে অস্বীকার করে। ব্যাপারটা কিন্তু অযোধ্যার রাজার** গোচরে আসে এবং তিনি একটা অজুহাত খুঁজে নিয়ে লন্ডনে একটা দৌত্য প্রেরণ করেন। চতুর্থ উইলিয়ম গোটা ব্যাপারটার কিছুই জানতেন না, নানা বাধা সত্ত্বেও দূত তাঁকে তার দেশে বিপদের কথা জানায়। তার ফল হয় চতুর্থ উইলিয়ম ও পামারস্টোনের মধ্যে একটা তুমুল কলহ এবং পরিণামে পামারস্টোনের ওপর কঠোর এই এক নির্দেশ জারি হয় যে, ভবিষ্যতে এরূপ কুদেতার পুনরাবৃত্তি করলে অবিলম্বে বরখাস্ত হতে হবে। স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাস্তবে অযোধ্যা গ্রাস ও দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্তি ঘটল যখন পামারস্টোন ফের ক্ষমতায়। কয়েক সপ্তাহ আগে কমন্স সভায় ১৮৩১ সালের অযোধ্যা

গ্রাসের এই প্রথম প্রচেষ্টা সংক্রান্ত দলিল-পত্র চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু বোর্ড অব কন্ট্রোলের সেক্রেটারি মিঃ বেইলি ঘোষণা করেন যে দলিল-পত্র উধাও হয়ে গেছে।

আবার, ১৮৩৭ সালে পামারস্টোন যখন দ্বিতীয় বার পররাষ্ট্র সচিব এবং লর্ড অকল্যান্ড ভারতের বড়োলাট, তখন অযোধ্যার রাজা*** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে বাধ্য হন। এ চুক্তিতে ১৮০১ সালের চুক্তির ৬ নং ধারা তুলে নেওয়া হয়, কারণ 'তাতে ধারাস্থ দায় পূরণের কোনো উপায় নেই' (ভালোভাবে দেশ শাসন), সুতরাং ৭ নং ধারা মতে চুক্তিতে পরিষ্কার বলা হয় যে,

'রাজ্যের পুলিসী ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগীয় ও রাজস্ব প্রশাসনের ত্রুটি দূর করার সেরা উপায় অযোধ্যা রাজ অবিলম্বে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সাথে একযোগে বিবেচনা করবেন, এবং হুজুর যদি ব্রিটিশ সরকারের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণে অবহেলা করেন এবং অযোধ্যা রাজ্যের ভিতর যদি এমন সব স্থূল ও ধারাবাহিক নিপীড়ন, নৈরাজ্য ও কুশাসন চলতে থাকে যাতে জন শান্তি গুরুতর রূপে বিপন্ন হয়, তাহলে যেখানেই এ রূপ কুশাসন ঘটেছে অযোধ্যা খণ্ডের তেমন যে কোনো অংশের ব্যবস্থাপনায় অল্পাকারে বা বৃহদাকারে এবং যত দিন প্রয়োজন বোধ হবে তত দিনের জন্য স্বীয় অফিসার নিয়োগের অধিকার ব্রিটিশ সরকার হাতে রাখছেন, এ রূপ ক্ষেত্রে সমস্ত খরচ-খরচা বাদে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা রাজকোষাগারে জমা দেওয়া হবে এবং আয় ব্যয়ের একটা সাঁচ্চা ও বিশ্বস্ত হিসাব হুজুরের নিকট দাখিল করা হবে।'

চুক্তির ৮ নং ধারার আরো আছে,

'৭ নং ধারা বলে অর্পিত কর্তৃত্ব গ্রহণে সপরিষদ ভারতের বড়োলাট যদি বাধ্য হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সম্ভবপর সমস্ত উন্নয়ন সহ তিনি গৃহীত এলাকার অভ্যন্তরে যথাসাধ্য দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও শাসনপ্রথা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, যাতে পুনরর্পণের উপযুক্ত সময় এলে এ সব এলাকা অযোধ্যার সার্বভৌমের হাতে পুনরর্পণ করার সুবিধা হয়।'

এ চুক্তি একপক্ষে ভারতের সপরিষদ বড়োলাট এবং অন্যপক্ষে অযোধ্যারাজের মধ্যে সম্পাদিত বলে উক্ত। সেই হিসাবে, উভয় পডউই তা অনুমোদন করেন এবং যথারীতি অনুমোদনের বিনিময় হয়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডে এ চুক্তি পেশ করা হলে, অযোধ্যারাজের সঙ্গে কোম্পানির মৈত্রী সম্পর্ক লঙ্ঘন ও বড়োলাটের পক্ষ থেকে এ রাজার অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে তা নাকচ করা হয় (১০ এপ্রিল, ১৮৩৮)। চুক্তি সম্পাদনের জন্য পামারস্টোন কোম্পানির অনুমোদন চাননি এবং তাদের নাকচ প্রস্তাব তিনি নজর করেননি। অযোধ্যারাজকেও কখনো জানান হয়নি যে চুক্তিটা নাকচ হয়েছিল। তার প্রমাণ দেন লর্ড ডালহৌসি স্বয়ং (১৮৫৬ সালের ৫ জানুয়ারি মিনিট),

'রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজার যে আলোচনা হবে সে আলোচনা কালে খুবই সম্ভব রাজা ১৮৩৭ সালে তাঁর পূর্ববর্তীর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির উল্লেখ করবেন। রেসিডেন্ট জানেন যে সে চুক্তি বলবৎ থাকেনি, ইংলন্ডে তা পাওয়া মাত্র কোর্ট অব ডিরেক্টর্স তা নাকচ করে দেন। রেসিডেন্ট আরো জানেন যে বর্ধিত সামরিক বাহিনী বিষয়ে ১৮৩৭ সালের চুক্তির কিছু কিছু কড়া শর্ত কাজে পরিণত করা হবে না এ কথা সে-সময় রাজাকে জানালেও চুক্তির সামগ্রিক খারিজের কথা কখনো হুজুরের গোচর করা হয়নি। এ নীরবতার পরিণতি ও পুরো বিজ্ঞপ্তির অভাব আজকে অস্বস্তিকর ঠেকছে। অস্বস্তি আরো বেশি এই কারণে যে সরকারি কর্তৃত্বে ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত চুক্তির একটি খণ্ডে নাকচ সন্ধিটা এখনো অন্তর্ভুক্ত।'

সেই মিনিটেই, ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

'রাজা যদি ১৮৩৭ সালের চুক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, অযোধ্যা শাসনে অতিরিক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়ে থাকলে, উক্ত চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকারকে যে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা বলবৎ করা হচ্ছে না কেন, তাহলে হুজুরকে জানাতে হবে যে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-কে জানানোর পর থেকে চুক্তিটার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাঁরা এটিকে পুরো নাকচ করে দিয়েছেন। হুজুরকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে সে-সময় লক্ষ্ণৌ দরবারকে জানানো হয়েছিল যে, ১৮৩৭ সালের চুক্তিরর যে কয়েকটি ধারা মতে রাজার ওপর অতিরিক্ত একটা সমর বাহিনীর খরচা চাপাবার কথা ছিল, তা মুলতুবী রাখা হবে। চুক্তির অন্য যেসব ধারা আশু

প্রযোজ্য ছিল না সে সম্পর্কে হুজুরকে কিছু জানানো তখন প্রয়োজন বোধ হয়নি বলে ধরতে হবে, এবং পরবর্তী পত্রপ্রেরণে অনিচ্ছাকৃত অবহেলা ঘটে।'

কিন্তু এ চুক্তি শুধু ১৮৪৫ সালের সরকারি সংকলনের অন্তর্ভুক্তই নয়, চালু চুক্তি হিসাবেও তার সরকারি উল্লেখ চিল ১৮৩৯ সালের ৮ জুলাই অযোধ্যারাজের নিকট লর্ড অকল্যান্ডের বিজ্ঞপ্তিতে, অযোধ্যারাজের নিকট (তদানীন্তন বড়োলাট) লর্ড হার্ডিং-এর ১৮৪৭ সালের ২৩ নভেম্বরের প্রতিবাদে এবং স্বয়ং লর্ড ডালহৌসির নিকট কর্ণেল স্লিম্যানের (লক্ষ্ণৌ-রেসিডেন্ট) ১৮৫১ সালের ১০ ডিসেম্বরের পত্রে। কিন্তু অযোধ্যারাজের সঙ্গে পত্রালাপে যা তাঁর সমস্ত পূর্ববর্তীরা এমন কি তাঁর নিজস্ব এজেন্টরা বলবৎ বলে মেনে নিয়েছিলেন সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকারের জন্য লর্ড ডালহৌসির অত ব্যগ্রতা কেন? তার একমাত্র কারণ এ চুক্তিতে হস্তক্ষেপের যে কৈফিয়ৎই পাওয়া যাক না কেন, সে হস্তক্ষেপ শুধু অযোধ্যারাজের নামে ব্রিটিশ অফিসারগণ কর্তৃক শাসনভার গ্রহণে সীমাবদ্ধ, উদ্বৃত্ত আয় যাবে অযোধ্যারাজের কাছেই। এ হল আকাঙ্ক্ষিতের ঠিক বিপরীত। রাজ্য গ্রাসের কমে চলত না। ২০ বছরের পরস্পর সম্পর্কের স্বীকৃত ভিত্তি যা জুগিয়ে এসেছে সে সব চুক্তির বৈধতা এইভাবে অস্বীকার, স্বীকৃত চুক্তিকেও প্রকাশ্য লঙ্ঘন করে স্বাধীন ভূখণ্ডগুলির বলপূর্বক এই দখল, গোটা দেশের প্রতি একর জমির এই চূড়ান্ত বাজেয়াপ্তি, ভারতের দেশীয়দের প্রতি ব্রিটিশের এই সব বিশ্বাসঘাতক ও পাশবিক আচরণের প্রতিশোধ এবার ঘটতে শুরু করেছে কেবল ভারতে নয়, ইংলন্ডেও।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৮ সালের ১৪ মে লিখিত সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
New-York Daily Tribune পত্রিকার ৫৩৩৬ নং সংখ্যায়
১৮৫৮ সালের ২৮ মে প্রধান প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত

* প্রথম নিকোলাস — সম্পাঃ।
* ওয়াজদ আলি শাহ — সম্পাঃ।
* উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক — সম্পাঃ।
** নাজির-উদ-দিন — সম্পাঃ।
*** মহম্মদ আলি শাহ — সম্পাঃ।
* জেমস উট্র্যাম — সম্পাঃ।